উনবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা

১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ

# বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

# বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

উনবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা ১৪২৬/২০১৯-২০২০

**সম্পাদক: ড. এম. আরিফুর রহমান**
**পরিচালক**

**বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**
সাভার, ঢাকা
www.bpatc.org.bd

**বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, উনবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০১৯-২০২০**
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 19th Year Issue 1426/2019-2020

**বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা**
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

**©বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**

**প্রকৃত প্রকাশকাল** : অগ্রহায়ণ ১৪২৬/নভেম্বর ২০২১

**বিপিএটিসি গ্রন্থাগার** : ০৫০

**টেলিফোন** : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ২০৮০-৮৫, ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০১০-১৬

**ফ্যাক্স** : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০২৯

**ওয়েব সাইট** : www.bpatc.org.bd

**গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা**

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : **১৬০.০০ টাকা মাত্র**

মূদ্রণে : **এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই**
৪৮/এবি, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

# সূচিপত্র


৭ই মার্চের ভাষণ: একজন বাচিক শিল্পীর শৈল্পিক উপস্থাপনা ................................ ০১

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম

ডিজিটাল বিপ্লব : উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ ............................................০৯

মোঃ জয়নুল আবেদীন

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: প্রয়োগ বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়........................ ৩৫

ড. জিল্লুর রহমান পল

নারী জনপ্রতিনিধিদের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি সমীক্ষা।..................................৬১

মোঃ রুহুল আমীন

# ৭ই র্মাচের ভাষণ: একজন বাচিক শিল্পীর শৈল্পিক উপস্থাপনা

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম*

**Abstract**

The nineteen-minute historic 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman turns up as a masterpiece of all times that crosses the human-set standard line and outplayed Bangabandhu placing him at an admirable height. This speech transfigured the time and yielded the independence of the country. Its touchy language and emotion, placement of words, presentation skills & style are of beyond the art. The voice reaches to thousands of hearts from a nation across millions of the world. Thus, the speech is not only an issue of one country's pride but also precious heritage of the world. Bangabandhu's speech is such a speech full of magical words, emotions that claims as the greatest one for all times: the past, present and future. This article is an attempt to analyze the 7th March speech of Bangabandhu in the light of skills of oration how it deeply influenced the whole nation to fight and achieve independence.

## ভূমকিা:

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের প্রায় উনিশ মিনিটের ভাষণ এক কালোত্তীর্ণ কবিতার শৈল্পিক উপস্থাপনা যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিজেকে ছাড়িয়ে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন এক মহান উচ্চতায়; একটি জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ। এর ভাষার গাঁথুনি, উপস্থাপনা কৌশল, বলার ধরণের কারণে ভাষণটি শিল্পোর্ত্তীণ মর্যাদা পেয়েছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে, একটি ভাষাভাষী মানুষের হৃদয় থেকে বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সময়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ব্যাপকতার রূপ ধারণ করছে। এই ভাষণ এখন আর আমাদের একার জাতীয় সম্পদ নয়, এটি আর্ন্তজাতিক সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী কথার যাদুতে এটি একটি অনন্য উপস্থাপনা, সকল সময়ের; অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের। প্রবন্ধটি মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি আবৃত্তির কলাকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত যে কীভাবে একটি ভাষণ মানুষের হৃদয়কে সুগভীর অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করে।

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, ইমইেল: rezapatc@gmail.com

## বাচিক শিল্পের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

ক্রোধ আর দ্রোহের তাপে প্রজ্জ্বলিত শব্দ বিন্যাসের সাথে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বরধ্বনির উচ্চারণ যে কত শক্তিশালী এবং স্থায়ীরূপ গ্রহণ করতে পারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার একটি অকাট্য প্রামাণিক দলিল।কবিতার মানদন্ডে এটি একটি মহাকাব্যিক গ্রন্থনা, উপস্থাপনা শৈলীতে কালোত্তীর্ণ; জনপ্রিয়তার স্বার্থে খ্যাতির শীর্ষে; প্রভাবক হিসেবে শক্তিশালী পরিবর্তনশীল একমাত্র অনুঘটক। গভীর ভাবাবেগ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সুনিপূণ কন্ঠের ছোঁয়ায় এই ভাষণ হয়ে উঠে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপনা। প্রতিটি শব্দই যেন প্রয়োজনীয়, অবশ্যম্ভাবী এবং অর্থবোধক। এর মাধ্যমে তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন বাঙালি জাতির সংগ্রামী ইতিহাসের সার্থক মুখবন্ধ।

তিনি একজন পরিমিতি বোধের কবি; পরিমিতিবোধ সম্পন্ন আবৃত্তিকার। বঙ্গবন্ধুর যেকোন বক্তব্য শোনার জন্য শ্রোতৃমন্ডলী কখনই অধৈর্য হতেন না জেনেও স্বল্প সময়ে কবিতার মাধ্যমে সকল কথা তিনি মাত্র উনিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করেছেন। সময়ের বিচারে খুব বড় বক্তৃতা না হলেও এর ব্যাপকতা অপরিসীম; যার প্রতিধ্বনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মানুষের হৃদয় থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা সকল মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। আবৃত্তিকারের একটা জায়গা থাকে কবিতার কোন লাইনে তাঁকে খুজে পাওয়া যাবে যা আসল কবিকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর শেষ দু'লাইন বঙ্গবন্ধুর সিগনেচার। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর পর থেকে কবিরা স্বাধীনতা শব্দটিকে একেবারে আমাদের করে নিয়েছেন।

আবৃত্তিকারের ধরণ ভিন্নতার কারণে যে কোন আবৃত্তি নতুন মাত্রা ধারণ করে। শব্দের প্রতি দরদ রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রক্ষেপন ঘটানো; স্বাচ্ছন্দ আর শ্রোতার গ্রহণ করার মাত্রার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কিছু শব্দমালার পর ক্ষণিক থামা, স্বরতন্ত্রের উঠানামা আবৃত্তিতে দ্যোতনা তৈরী করে যার জন্য শ্রোতা হারিয়ে যায় শব্দের ভিতর, বাক্যের মধ্যে, আবৃত্তিকারের মাঝে। প্রতীক্ষারত আগ্রহী শ্রোতৃমন্ডলী গভীর উত্তেজনা নিয়ে আবেগতাড়িত হন। তিনি যখন দরাজ গলায় উচ্চারণ করেন, 'ভাইয়েরা আমার...' সে এক সুনিপূণ কারুকাজ। পুরো পৃথিবী থমকে দাড়ায় কিছু সময়ের জন্য। এই হালকা বিরতির কারুকাজ আর কোন আবৃত্তিকারের জন্য আর কখনই তৈরী হবে না। তিনি স্বভাবজাতভাবে যখন আবৃত্তি চালিয়ে যান, শ্রোতা উদ্বেলিত হয়, উচ্ছসিত হয়, আমোদিত হয়, আন্দোলিত হয়। এই পরিবর্তন শ্রোতার মনোজগতে আমূল পরিবর্তন আনে; তাকে ধাবিত করে অর্জনের লক্ষ্যে; সৃষ্টিশীলতার মোহে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে যায়। এতটাই আন্দোলিত হয় সে কবিতাই তার ধ্যান-জ্ঞানে রূপদান করে। সাহস সঞ্চারিত করে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, নিজের সকল আশা-আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আবৃত্তিতে

মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে আবৃত্তির মর্মবাণী অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এ এক কণ্ঠশিল্পীর অপার দান; অসীম ক্ষমতা। সেদিনের সেই মহাক্ষণের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকার মামুনুর রশিদ তাঁর অনুভূতির বর্ণনা দেন, ৭ই মার্চের ভাষণের একেকটা শব্দ, বাক্য বঙ্গবন্ধুর দরাজ কণ্ঠের উচ্চারণ সরাসরি বুকের মধ্যে আঘাত হানতে লাগল' । শক্তি, সাহস সঞ্চয় করে উদ্বুদ্ধ হলেন নতুন মানচিত্র ছিনিয়ে আনার দুর্নিবার প্রয়াসে।

শিল্পের বিচারে বাচিক শিল্পী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কালোত্তীর্ণ; সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন স্বমহিমায়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ধারার বাইরে সকল কবির জন্য কবিতার রসদ অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। সমসাময়িক কালের উত্তরণ ঘটিয়ে আধুনিক এবং উত্তরাধুনিকতার জন্ম দিয়েছেন এবং উত্তরাধুনিক কবিদেরকে অবলীলায় অতিক্রম করে যোজন যোজন দূরত্বে পেছনে রেখে সঙ্গে করে এনে উপনীত হয়েছেন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাছে। সীমা-পরিসীমার বিচারে শুধুমাত্র দেশীয় দলিলের বাইরে এটি একটি বিশ্ব প্রামাণিক দলিল। ষোল কোটি মানুষের বাইরে এটি লক্ষ কোটি মানুষের সম্পদ। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের অনুপ্রেরণার একটি সুদীর্ঘ স্রোতস্বিনী; স্বাধীনতা প্রত্যাশী তৃষ্ণার্ত জাতির তৃষ্ণা নিবারণের এক স্বচ্ছ সরোবর। ৭ই মার্চের ভাষণ যেকোন বিচারে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ আবৃত্তি। তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক ধরণ আছে যা তাঁর নেতৃত্বের চেয়েও বেশি কিছু; যা তাঁকে অনন্যতা দান করেছে। দৃপ্তপদে মঞ্চে উঠে দু'হাত পিঠের দুপাশে দিয়ে ডানে বামে একটু ঘুরে উপস্থিত শ্রোতাদের নিজের করে নিলেন; সেই সাথে তৈরী হলো তাঁর অবস্থানের এক শক্ত ভীত। সে ভিত্তি শুধু একটি দেশের পরিপূরক নয়, হাজার বছরে সৃষ্ট একটি দেশ সে ভিত্তির উপর দাড়িয়ে রইলো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যে ভিত্তি তাঁর শিল্পী স্বত্তার স্থায়িত্বের ভিত্তি; যে ভিত্তি নিজস্বতার জায়গা, যে ভিত্তি হিমালয়সম এক মহানায়কের প্রতিকৃতি। যে জায়গাটা তিনি শুধু নিজের করে নিয়েছেন তা নয়, সমগ্র পারিপার্শিক অবস্থাকে একটি দেশ, জাতির জন্য একটি চলমান শিল্পে রূপান্তর করেছেন।

কবিতার ভাষা সাধারণের ভাষা হলে তার ব্যাপকতা হয় গভীর। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, দৈনন্দিন কার্যক্রমকে প্রভাবিত ও ব্যক্তিগত জীবনকে আন্দোলিত করে। সাবলীল বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণের পাশাপাশি দু'একটি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ভাষার সর্বজনীন রূপ এবং সারাদেশের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। একই রকমের একঘেয়েমির পরিবর্তে নতুন দ্যোতনা তৈরী করেছে। 'দাবায়ে রাখতে পারবনা'। শুদ্ধ বাংলায় উচ্চারিত হলে তার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কখনই এর মতো হতোনা। আবার সমসাময়িক শব্দচয়ন বিষয়কে যেমন স্পষ্ট করে, শ্রোতাকে দারুণভাবে আকৃষ্টও করে। যার ফলে তিনি সবার কাছে পরিচিত ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করেন; যেমন 'এসেম্বলি কল করেছে', ' সামরিক আইন মার্শাল উইথড্র করতে হবে'। সময়কে উপস্থাপনের জন্য; সময়কে ধারণ করার জন্য; একটি সময়কে অন্য সময়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো সংযোজন আর কিছু হতে পারে না।

কবি তার কবিতার সন্নিবেশিত শব্দমালার মাধ্যমে সময়কে ছাড়িয়ে যাবার সচেষ্ট ধারা অব্যাহত রাখেন; আর আবৃত্তিকার তাঁর ঢং, ধরণ ও উপস্থাপনা কৌশলের মহিমায় বর্তমানের সময়কে ভেদ করে ক্রমাগত উত্তরণের পথে ধাবিত করেন। তিনি সময়কে ছাড়িয়ে যান। বঙ্গবন্ধু তাই কালোত্তীর্ণ এবং তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ তাই সময়ের বেড়াজালে আবৃত্ত যে কোন সীমারেখার গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেছে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে যার আবেদন সময় আর একটি ভাষার মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবননান্দ দাশের বনলতা সেন, আশরাফ সিদ্দিকীর তালেব মাষ্টার, সৈয়দ শামসুল হকের আমার পরিচয়, শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা তুমি, হেলাল হাফিজের কষ্টের ফেরিওয়ালা কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্রের মত কালজয়ী-অন্যবদ্য কবিতা কবিদের যেমন মহান ও অমরত্ব দান করেছে; তেমনি বঙ্গবন্ধুর এই একটি মাত্র ভাষণই তাঁকে যুগ থেকে যুগান্তরে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

কবিতার ছন্দ মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে; সাধারণ মানুষ তাই ছন্দবদ্ধ কয়েক পংক্তির কবিতা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। বর্ণনার আঙ্গিকে উপস্থাপিত গদ্যের সে প্রভাব তাই কবিতার মত একটি বিষয়কে যেমন দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না তেমনি সাধারণত শক্তিশালী আবেদন তৈরী করতে পারেনা। সাহিত্য সমালোচকগণ যথার্থই বলেছেন যে গদ্য ছন্দের রাজত্বে আপাত দৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা থাকে তার মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন বা সর্বজনীন করে তোলা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার (ইকবাল, ২০২০)। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণ গদ্য ছন্দে রচিত হলেও এর কাব্যিক ঢং, বৈচিত্র্য শুধু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি; কাব্যের জগতে এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা; আবৃত্তিজগতে যুগসৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একই সাথে রাজনীতির কবিদের নতুন সাহিত্যধারার বিষয়টিতেও আবৃত্তিকে অসীমত্ব দান করেছে।

আবৃত্তির জন্য কবিতা নির্বাচন একটি দুরূহ বিষয়। আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বোধ ও মানদন্ডের প্রয়াসে আবৃত্তিকারকে ঈর্ষণীয় তুমুল জনপ্রিয়তা দিতে পারে। ৭ই মার্চের ভাষণ আবৃত্তিকারের জনপ্রিয়তার তুলনা করার মত সাধারণ শব্দগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যে বিরল। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রন্থিত কবিতার উচ্চারণ বরাবরই শোষিতের হৃদয়, মনন এবং মস্তিস্ককে একইসাথে আকৃষ্ট করে এবং যুগপৎ শক্তিশালী কার্যকরী ভুমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ এমনই এক উচ্চারণ। আবৃত্তিগুণে বোদ্ধা থেকে শুরু করে নিরক্ষর সাধারণ মানুষকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে ভাষণের কোন কোন পংক্তিমালা বার বার অনুরণিত হওয়ার বিষয়; কোন কোন শব্দ কোন কোন কবির বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম; কিংবা গবেষকের গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। আবৃত্তিকার ভালোভাবেই জানতেন তার আবৃত্তির শ্রোতৃমন্ডলী কারা; শ্রোতারা কোন বিষয়টি শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে থাকেন। গবেষকরা বলেন বঙ্গবন্ধু এক্সট্রা-অর্ডিনারি সেনসরি পাওয়ারের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সাধারণ মানুষের মনের চাওয়া-আকাঙ্খাকে

বাস্তবে রূপদান করার জন্যে সহজ, সরল ভাষায় বলে গেছেন যা আবৃত্তির মাধ্যমে একটি সেতু বন্ধন তৈরী হয়েছে।

আবৃত্তি সবসময়ই সাবলীল হয় যখন কবিতাটি আবৃত্তিকারের আয়ত্বে থাকে, পুরোপুরি মুখস্থ থাকে। সেক্ষেত্রে আবেগের মাত্রা, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশি বাস্তব ও সৃজনশীল হয়ে উঠে। ৭ই মার্চের ভাষণ একটি উপস্থিত বক্তৃতা যার কোনকিছুই লিখিত নয়। আবৃত্তিকার তাঁর দর্শকদের দৃষ্টির আড়াল করেননি আত্মিক যোগাযোগের মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। এমন আবহ তিনি তৈরী করেছিলেন যেন প্রতিটি উপস্থিত দর্শক এবং অগণিত অনুপস্থিত দর্শকের কাছে, দর্শকের সামনে তিনি সৃষ্টিশীলতা উপস্থাপন করছেন। আবৃত্তিকারের কৃতিত্ব সেখানেই যখন তার আবৃত্তি তাকে ছাড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে দর্শকের মুখে মুখে। গণনার সংখ্যাতত্ত্বের সীমিত পরিসর থেকে অগণিত হৃদয়ের তন্ত্রীতে, শিরা উপশিরা ধমনীতে; বংশ পরম্পরায়।

কবিতা নির্বাচন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আগ্রহী শ্রোতা, আবৃত্তির বিষয়াবলী এসবই একটি মনোত্তীর্ণ আবৃত্তির জন্য অপরিহার্য বিষয়। সেদিনের সেই রেসকোর্স ময়দান একজন কবির কবিতার আসর হয়ে জমে উঠেছিল। একক কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান। একটি প্রহরের একটি ছোট্ট সময়ের সংযোজন সকলকে আন্দোলিত করেছিল। আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত এক সময়ের মুখ্য হয়ে উঠা একজন বাচিক শিল্পীর কাছে গৌণ হয়ে যায়। পরিবেশ, পরিবেশের প্রতিটি অংশই তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যায়। একটি বিশাল মাঠ একজন ব্যক্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়; একটি বিশাল আকাশ একজন আবৃত্তিকারের বিশালত্বকে ধারণ করতে পারেনি;  উনিশ মিনিটের শব্দমালা হাজার হাজার শব্দসম্ভার তৈরী করে; প্রায় উনিশ মিনিট সময়ের কাছে একটি দেশ কেঁপে উঠে । যে দেশটির নাম পুরো উনিশ মিনিটের  বক্তৃতাতে তিনি একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি ।

## উপসংহার

উপস্থাপনা কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, মুভমেন্ট, প্রক্ষেপন, শারীরিক ভাষা, আবৃত্তিকারের পরিধেয় আবৃত্তির পরিবেশকে শৈল্পিক করে তোলে। আবৃত্তির গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। একজন আবৃত্তিকার সচেতন ভাবে এসব বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করে তার আবৃত্তিকে সবার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বঙ্গবন্ধুর কাছে এসব বৈশিষ্টের ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। তার চলন নতুন মাত্রা যোগ করে। তার পরিধেয় বস্ত্র অনুকরনের পর্যায়ে পড়ে; তার উচ্চারণ ও বলার কৌশল অন্যদের জন্য অনুসরণের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী হয়েছে। আবৃত্তির কৌশল এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ই বরং বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে মনে হয়। যার ফলশ্রুতি অগণিত দর্শকশ্রোতার অধীর আগ্রহের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার অবসানে, আবৃত্তি শোনার আগ্রহে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ভেসে আসে শ্লোগান; প্রতীক্ষারত দর্শকশ্রোতার আবেগ-মিশ্রিত স্বগতোক্তি।

সবাই শুনবেন সেই মহাবাণী, যার জন্য প্রস্তুত তবে সেই কবিতা শোনা হয়নি। যে কবিতা শোনা হল তা ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের বিকেলে শেষ হলেও রেশ রয়ে গেল বহুকালের জন্য; অস্তমিত সুর্যটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই মহামানবের দিকে।

## সহায়ক গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধসমূহ:

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান (২০১৮), কালোত্তীর্ণ ভাষণ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2018-03-07/9

আব্দুল গাফফার চৌধুরী (২০১৫), চারটি ঐতিহাসিক ঘোষণার একটি ৭ই মার্চের ঘোষণা, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ, http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2015-03-07/4

ইকবাল ভুইয়া (২০২০), ’রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু’, নতুন দিগন্ত, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ৮৯-১০০.

একে আবদুল মোমেন (২০২০), ভাষণসমগ্র (১৯৫৫-১৯৭৫): শেখ মুজিবুর রহমান, চারুলিপি, ঢাকা।

ড. এম এ মান্নান (২০১৯), বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2019/03/07/page-04

ড. মোহাম্মদ হাসান খান (২০১৯), বাঙালির মুক্তির সনদ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2019/03/07/page-04

ড. এম এ মান্নান (২০২০), বঙ্গবন্ধুর কাব্যময় ভাষণেই ছিল স্বাধীনতার আহবান, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2020/03/07/page-04

ড. কাজল রশীদ শাহীন (২০২০), বাঙালি জাতির ইশতেহার যে ভাষণ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2020/03/07/page-04

ড. খন্দকার বজলুল হক (২০১৯), বিশ্বের এক অনন্য ভাষণ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2019-03-07/8

তোফায়েল আহমেদ (২০১৮), বিশ্বসভায় বজ্রকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2018-03-07/9

তোফায়েল আহমেদ (২০১৯), সাতই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ, দৈনিক যুগান্তর, ৭ই মার্চ। https://epaper.jugantor.com/2018/03/07/

তোফায়েল আহমেদ (২০২০), মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ।http://epaper.ittefaq.com.bd/?date=2020-03-07

তোফায়েল আহমেদ (২০২০), নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরের ডাক, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ। http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2020-03-07/5

নয়ন (২০১৮), একটি ভাষণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপকার, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, http://epaper.ittefaq.com.bd/?date=2018-03-07

মীর আব্দুল আলীম (২০২০), ৭ই মার্চের অর্জন, দৈনিক সংবাদ, ৭ই মার্চ, http://epaper.thesangbad.net

ফরিদুন্নাহার লাইলী (২০১৭), সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2017/03/07/page-04

র আ ম উবায়দুল মোক্তাদীর চৌধরী (২০১৭), ইতিহাসের গতিপথ ও ৭ই মাচ, দৈনিক আমাদের সময়, ৭ই মার্চ, https://epaper.dainikamadershomoy.com/2017/03/07/page-04

সমকাল (২০২০), সেই বিকেলের প্রত্যক্ষদর্শী, দৈনিক সমকাল, ৭ ই মার্চ।

সৈয়দ আনোয়ারহোসেন (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও সম্মোহনী নেতা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা সিরিজ, তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০২০.

সৈয়দ মন্জুরুল ইসলাম (২০১৬), মানুষের সামনে পথ খুলে গেল: ৭ই মার্চের ভাষণ, দৈনিক সমকাল, ৭ই মার্চ, http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2016-03-07/8

শেখ হাসিনা, বিশ্ব প্রামান্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পাঞ্জেরি প্রকাশনা, ঢাকা।

# ডিজিটাল বিপ্লব : উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ

মোঃ জয়নুল আবেদীন*

## সার-সংক্ষেপ

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন ও প্রয়াস তৈরী হয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ সেই স্বপ্ন পূরণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ঘোষণা করেন যে '২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' পরিণত হবে। যাতে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন নতুন এক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সব মিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশীদারিত্বে সরকারী সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। মূলত এই ধারণার মধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের প্রয়াস লুকায়িত। গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য। বিগত দশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে যা ডিজিটাল অর্থনীতি ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণের পথ সুগম করেছে। বর্তমান সরকারের ব্যবসা বান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে রপ্তানির পরিমাণ ১ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। সরকার আগামী ৫ বছরে আইসিটি খাতের রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ, ৯০ ভাগ সেবা অনলাইনে প্রদান, দেশের শতভাগ জনগণকে কানেকটিভিটির আওতায় আনা এবং আরও ১ মিলিয়ন জনবলের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। জাপানের মতো উন্নত দেশের ১০ হাজার অ্যাপার্টমেন্টকে স্মার্ট করার কাজটা আমাদের তরুনদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের তৈরি সফটওয়্যার ও আইটি সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড়

* *প্রিন্সিপাল অফিসার, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।*

ওয়েব পোর্টাল করা হয়েছে আমাদের দেশে। বিশেষজ্ঞরা তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক এই অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আখ্যায়িত করছেন ডিজিটাল রেনেসাঁ বা ডিজিটাল নবজাগরণ হিসেবে। ইউরোপের রেনেসাঁ বিপ্লবের কথা আমরা জানি। সেই বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। বাঙালী হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবের বিষয়টি এক সময় আমাদের কাছে সোনার হরিণ বলে মনে হতো। কিন্তু সময়ের পালা বদলের ধারায় বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বিপ্লবের নবদিগন্তের সূচনা করেছে। সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি ক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, ব্যাংকিং ক্ষেত্রে, সরকারী সেবার ক্ষেত্রে, মোবাইল ও ইন্টারনেট এর ক্ষেত্রে, মহাকাশ অভিযানে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, দাপ্তরিক কাজে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথ্য প্রযুক্তির অভুতপূর্ব অগ্রগতি ও উন্নয়ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ট্রেন'কে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে চালিয়ে নিতে দেশে নতুন প্রজন্মের অসংখ্য উদ্যমী তরুণ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে এবং আরও অনেকেই তৈরি হচ্ছে। তাদের সফলতাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে।

## ভূমিকা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে বোঝায় দেশের সব নাগরিককে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারার সক্ষমতা তৈরি করা। উপরন্তু তার চারপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে জীবনধারাটি যন্ত্র-প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক অনন্য নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হয়। শিক্ষাসহ সরকারি-বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা, কৃষি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা জীবন-যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্র ডিজিটাল করা হচ্ছে। বর্তমান যুগে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আহরণ, তথ্য বিতরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আহরণ এবং এর সাথে জড়িত সকল প্রকার কার্যাবলী পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া হলো তথ্য প্রযুক্তি। বর্তমান বিশ্বে একক তার বা একক লিঙ্ক পদ্ধতির মাধ্যমে অডিও-ভিজুয়াল, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও টেলিফোন নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে প্রযুক্তির সুফল পাওয়া যায়। যার ফলে অনেক বড় অঙ্কের অর্থনৈতিক খরচ কমে যায়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের কাতারে সামিল হতে ডিজিটাল বাংলাদেশের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অমিত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এই সম্ভাবনাকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ গড়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অনিবার্য বিষয়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশ গড়ায় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে

সরকারের সময়োপযোগী ঘোষণা ও সার্বিক প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে আজ তথ্য প্রযুক্তির উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং ডিজিটাল বিপ্লব বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

## ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ নিছক কোনো পরিকল্পনা বা চমক ছিল না। বরং, এটি ছিল একুশ শতকের বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার রূপরেখা; যার বীজ বপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এখন অন্য দেশকে জ্ঞানগত সহায়তা প্রদান করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এ মহাযজ্ঞ এবং বিশাল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। একজন আন্তর্জাতিক তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হবার সুবাদে পৃথিবীর নানান দেশের উন্নয়ন মডেল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি কোন দেশের মডেল অনুসরণ না করে নিজের দেশের চাহিদা এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নতুন মডেল প্রদান করেছেন।

তিনি বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে দেশকে চারটি শক্তিশালী স্তম্ভের উপর দাঁড় করাতে হবে। এগুলো হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০ লক্ষ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, সবার জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের একটি শক্তিশালী ব্যবসায়িক খাত প্রতিষ্ঠা করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর নির্দেশ এবং পরামর্শে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নতুন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা জীবন-যাপনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লেগেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া। সরকারি-বেসরকারি খাত ও তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। সরকার ও বেসরকারী খাতের অংশীদারিত্বে সরকারী সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞান ভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের

জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের পথে যাবতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ। মুলতঃ সরকারের এই ধারণা থেকেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের প্রয়াস লুকায়িত।

## তথ্য প্রযুক্তি খাতের গুরুত্ব

আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞানের গৌরবময় ভূমিকার জন্যই বিশ্ব সভ্যতা আজ উন্নতির শীর্ষে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া কোন দেশ তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির স্থলে ডিজিটাল টুলস ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সকল কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের দারিদ্র্য, প্রশাসনিক জটিলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মন্থর গতি প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য তথ্য প্রযুক্তি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। উন্নত দেশসমূহ ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সকল ক্ষেত্রে কাংখিত উন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জনপ্রশাসনের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অধিকতর উন্নত জনসেবা প্রদানের জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের অপচয় রোধ এবং জনসেবার মান উন্নয়ন, সমন্বিত ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম করার ফলে অটোমেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

## বিশ্বায়নে তথ্য প্রযুক্তি খাতের গুরুত্ব

বিশ্বায়ন (globalization) বিংশ শতকের শেষভাগে উদ্ভূত এমন একটি আন্তর্জাতিক অবস্থা যাতে পৃথিবীর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তঃদেশীয় পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর ফলে সারা বিশ্ব একটি পরিব্যাপ্ত সমাজে পরিণত হয়েছে এবং অভিন্ন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ যুগপৎ অংশগ্রহণ করছে। একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিস্তৃত। বাংলাদেশে দেরিতে হলেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। গবেষণা থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, যোগাযোগসহ,

মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সর্বস্তরে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্যে বিশ্বায়নে তথ্য প্রযুক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফরচুন ম্যাগাজিনের নির্বাচিত বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০ কোম্পানির সিইওদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। প্রযুক্তি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে যারা দ্রুত খাপ খাইয়ে নেবে তারাই এগিয়ে যাবে, আর যারা দেরি করবে তারা ছিটকে পড়বে। প্রযুক্তি ব্যক্তি পর্যায়েও অনেকের জীবনে ক্ষমতায়নের সুযোগ এনে দিয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে নানা সমস্যার সমাধানেও প্রযুক্তির অবদান রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ২০১৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেয়া ভাষণে বলেন, প্রযুক্তির প্রচলন ছড়িয়ে পড়ার সুবাদে আজকের দিনে জন্ম নেয়া শিশু তাদের আগের প্রজন্মের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করছে। তাই বিশ্বয়নে তথ্য প্রযুক্তি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

## জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সহজ হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ মুহুর্তের মধ্যে সারা বিশ্বে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে। শিক্ষাসহ সরকারি-বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা, কৃষি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা জীবন-যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করে চলেছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষ ঘরে বসেই ব্যাংকিং লেনদেন, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ ব্যবসায়িক লেনদেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে পারছেন। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কম কর্মঘন্টা ব্যয় করতে হচ্ছে। মানুষের আয়ের সুযোগ তৈরী হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ফলে যোগাযোগ খাতে উবার, পাঠাও, ওভাই ইত্যাদি এ্যাপ ব্যবহারে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। মানুষের জীবন-যাপনকে সহজ করে দিয়েছে যোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা। কাজেই জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

## ডিজিটাল বিপ্লব: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির ১০ বছর

ডিজিটাল বিপ্লবের পথ ধরে একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে তাই ডিজিটাল বিপ্লবে সামিল হওয়া এবং আইসিটির

ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনটি বাতিঘর যথা- আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি এবং সুশাসনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি বাতিঘরের আলোয় আলোকিত হয়েছে পুরো বাংলাদেশ। গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য। বিগত দশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে যা ডিজিটাল অর্থনীতি ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণের পথ সুগম করেছে। বিগত দশ বছরে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অর্জনের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো :

**(১) বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণ :**

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের ভিজুয়াল কালার ভার্সন এবং বিশ্বসেরা এই ভাষণের ২৬ টি নির্বাচিত বাক্য দেশের ২৬ জন খ্যাতিমান লেখকের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়ে ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণ : রাজনীতির মহাকাব্য’ শীর্ষক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ রচনা করে তা প্রযুক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ডিজিটাল ভার্সনে (মোবাইল এ্যাপ ও ই বুক) রূপান্তর করা হয়েছে।

**(২) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ :**

মহাকাশে লাল সবুজের পতাকার রংয়ের নকশাখচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের ৫৭তম সদস্য হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ একটি ভূ-স্থির যোগাযোগ স্যাটেলাইট। যা থেকে মূলত তিন ধরনের সেবা পাওয়া যাবে- ১. সম্প্রচার, ২. টেলিযোগাযোগ, ৩. ডাটা কমিউনিকেশনস। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে কম খরচে আরও বেশি সংখ্যক টেলিভিশন চ্যানেল দেখা যাবে।

**(৩) হাই-টেক শিল্প/ডিজিটাল ল্যাব/ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার/ডাটা সেন্টার স্থাপন:**

- বাংলাদেশ হাই-টেক/আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশ ও বিস্তার, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তাদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট প্রদান, মেন্টরিং, কোচিং ও রিসার্চ

ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;

- বিশেষায়িত ল্যাব বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিটি/হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;

- সারাদেশের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৯০১ টি কম্পিউটার ল্যাব, জেলা পর্যায়ে ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং ১০০ টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং জাতীয় টিয়ার থ্রি এবং টিয়ার ফোর ডাটা সেন্টার স্থাপনা করা হয়েছে।

**(৪) ফোর জি (৪-জি) নেটওয়ার্ক :**

ইতোমধ্যে দেশের জেলা ও বিভাগগুলোকে ফোর জি (৪-জি) নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফাইভ জি (৫-জি) চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

**(৫) ইন্টারনেট সংযোগ ও এর ব্যবহার :**

- পুরনো পণ্য সেবাগুলোর জায়গায় হালনাগাদ পণ্যসেবা দ্রুত চালু হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্মার্টফোনের সক্ষমতা, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ক্লাউড কমপিউটিং, কোয়ানটাম কমপিউটিং, রিয়েল-টাইম স্পিচ রিকগনিশন, ন্যানো কম্পিউটার, উইয়ারেবল ডিভাইস ও নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন, সাইবার সিকিউরিটি, স্মার্ট সিটিজ, ইন্টারনেট- এ সব পণ্যসেবার বিকাশ ঘটছে। ৩৮০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে; সরকারের ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান, ২২৭টি সরকারি অফিস ও ৬৪ টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ ১৮,৪৩৪ টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে, ৮০০ এর বেশী ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ১০০০ পুলিশ স্টেশনে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ, ২২০৪ টি ইউনিয়নে ওয়াই-ফাই সংযোগ চালু রয়েছে;

- ২০১৬ সালে গৃহীত 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' দ্বীপে তিনটি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেটের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। ১০ বছর আগে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে সাড়ে ৯ কোটিতে পৌঁছেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে এত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্যই ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০;

- বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি; ২০০৯ সালে টেলিডেনসিটি ছিল ৩০%, মার্চ ২০১৯ এ ৯৮.৪৬% এ উন্নীত করা হয়েছে; ২০০৮ সালে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল ২.৬৭%, যা মার্চ ২০১৯ এ ৫৬.৮৯% এ উন্নীত করা হয়েছে; ইন্টারনেট ওয়াল্ড স্ট্যাটাস ডট কম হতে জানা যায়, ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ হতে মার্চ ২০১৯ এ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বিশ্বে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশী হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- নিম্নে ইন্টারনেট পেনিট্রিশন ও মোবাইল সার্ভিস পেনিট্রিশনের অগ্রগতির চিত্র উল্লেখ করা হলো (তথ্য সূত্র- বিটিআরসি) :

**টেবিল নম্বর ১ ও ২ ইন্টারনেট**
**পেনিট্রিশন ও মোবাইল সার্ভিস পেনিট্রিশনের অগ্রগতির চিত্র।**

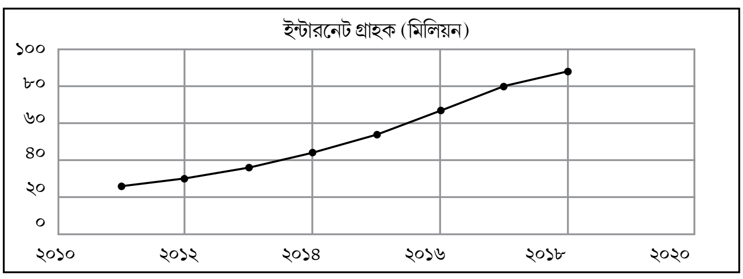


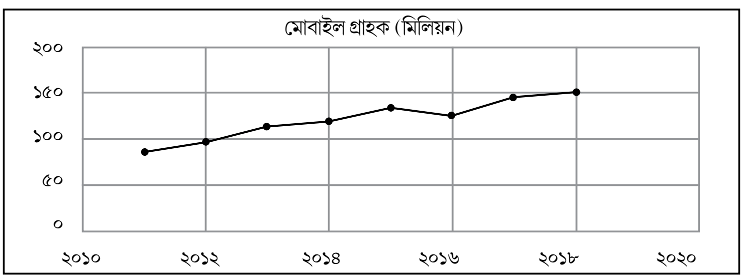

**(৬) কর্মসংস্থান সৃষ্টি :**

- লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫,০০০+ আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানুষ তৈরি করা হয়েছে। এফটিএফএল কর্মসূচির আওতায় বিগ ডাটা অ্যানালিস্ট, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইওটি, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, ব্লক চেইন, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং চাকরি প্রদান করা হয়েছে;

- লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫৭,০১০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ট্রেনিং প্রাপ্তরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করেছে;

- বর্তমানে বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রযুক্তিনির্ভর যেসব ব্যবসা বিশ্বে বেশ আলোচিত তার মধ্যে অন্যতম হলো আউটসোর্সিং, বিজনেস প্রসেস আউসোর্সিং, ডিপিও বা ডকুমেন্ট প্রসেস আউটসোর্সিং ও কল সেন্টার ধারণা প্রভৃতি। বিপুল সম্ভাবনাময় এই খাত থেকে দেশে আনা সম্ভব বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স। আউটসোর্সিংয়ে ডাটা এন্ট্রি, মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশনের পর এখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, আইপি অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল কনটেন্ট, কার্টুন, প্রিন্টিং ওয়ার্ক, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ব্যাক অফিস ওয়ার্ক, ডকুমেন্ট প্রসেস আউটসোর্সিং, টু-ডি, থ্রি-ডি এনিমেশন, আর্কিটেকচারাল ওয়ার্কসহ নানা ধরনের কাজ আসছে বাংলাদেশে। আউটসোর্সিং হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে স্মার্ট জব;

- ইতোমধ্যে ১৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;

- বর্তমানে এ খাতে আইটি ম্যানেজার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এনালাইজার, কল সেন্টার এজেন্ট, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার, মাল্টিমিডিয়া অথার, এনিমেটর, হার্ডওয়ার টেকনেশিয়ান, সিস্টেম এ্যানালিস্ট, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলপার, প্রোগ্রামার, নেটওয়ার্ক এডমিন ইত্যাদি বিষয়ে চাকুরীর সুযোগ তৈরী হয়েছে;

- শী পাওয়ার প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪,০০০ নারীকে আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার এবং প্রায় ২,৫০০ নারীকে কল সেন্টার এজেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

## (৭) কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি :

- কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কল সেন্টার থেকে বিনামূল্যে কৃষি বিষয়ক সব তথ্যই যুক্ত হয়েছে তথ্য বাতায়নে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেই কৃষকরা কৃষিবিষয়ক সব পরামর্শ পাচ্ছেন। কৃষি বিপণনে মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ কৃষক বান্ধব হিসেবে কাজ করে চলেছে। এর সঙ্গে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে ড্রোন সিস্টেম অটোকপ্টার যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা এবং যা রেডিও পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত;

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধান ও মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ও জাতীয় ক্ষুদ্রসেচ নীতি বাস্তবায়ন করেছে; কৃষি বাতায়ন (www.krishi.gov.bd) দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে কার্যকরি ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘কৃষি বাতায়ন’। বর্তমানে কৃষি বাতায়নে ৭৮ লাখ কৃষকের তথ্য সংযুক্ত রয়েছে।

## (৮) শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি :

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ছবিযুক্ত পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি করে উক্ত ডাটাবেইজের বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অনলাইনে ভর্তি আবেদন, শিক্ষার্থীদের স্বয়ংক্রিয় প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র, ডিজিটাল আইডি কার্ড, ছাড়পত্র প্রিন্ট, প্রতিষ্ঠানের সব অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল তৈরি ও অনলাইনে ডাউনলোড, পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, গ্রেডিং সিস্টেমের ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষক/শিক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক অনলাইন হাজিরা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের পেমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য এসএমএস, শিক্ষক/কর্মচারীদের ছুটি ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংক্রিয় হিসাব ব্যবস্থাপনা, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টিউশন

ফি প্রদান ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরার সাহায্যে অনলাইন নজরদারী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কাছে এসএমএস নোটিফিকেশন প্রেরণসহ আরও অনেক সুবিধা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও স্পীকারের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে;

- ‘কিশোর বাতায়ন’ www.konnect.gov.bd কিশোর কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক বাতায়ন www.teachers.gov.bd প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম, ‘মুক্তপাঠ’ www.muktopaath.gov.bd বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম।

## (৯) চিকিৎসা সেবায় তথ্যপ্রযুক্তি :

- তথ্যপ্রযুক্তি চিকিৎসা সেবায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। এ ছাড়াও দেশে টেলি-মেডিসিন সেবার দ্রুত বিকাশ ঘটছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্কাইপের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যেমন রোগের চিকিৎসা চলছে, তেমনি গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলের প্রশাসনিক কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে।

## (১০) বিভিন্ন সেবা একসঙ্গে পাওয়া :

- সরকারের সেবামূলক কাজের মধ্যে সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যে ডাটা/তথ্য ইলেক্ট্রনিক উপায়ে আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য (BNDA)-এর অংশ হিসেবে ই-গভর্নেন্স ইন্টার অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF) প্রস্তুত করা হয়েছে, ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ৩৫০০০ জন শিক্ষার্থী হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে, টেন্ডারবাজি ও দুর্নীতি কমাতে ইতোমধ্যে সরকারি অফিসে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু হয়েছে;

- দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকরা ৩৩৩ এবং প্রবাসীরা ০৯৬৬৬৭৮৯৩৩৩ নম্বরে কল করে সরকারি সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের

সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য, পর্যটন আকর্ষণযুক্ত স্থানসমূহ এবং বিভিন্ন জেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জানতে পারছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে পারছেন;

- জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে জনগণের জন্য মোবাইল ফোন ভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯' চালু করা হয়েছে;

- ১০৬ দুর্নীতি দমন কমিশন, ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ১৬২৬৩ নম্বরে, ১৬১২৩ নম্বরে কল করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে, ৩৩৩১ কৃষকবন্ধু ফোন সেবা কৃষি বিষয়ক, ১০৫ জাতীয় পরিচয়পত্র নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে, পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে, ভুল সংশোধন ও হালনাগাদ করাসহ যাবতীয় তথ্য, ১৩১ বাংলাদেশ রেলওয়ে, ১০৯৮ চাইল্ড হেল্প লাইন সুবিধাবঞ্চিত, নির্যাতিত ও বিপদাপন্ন শিশুদের জন্য ২৪ ঘণ্টা জরুরি সহায়তা, ১০৯ অথবা ১০৯২১ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, ১৬১০৮ মানবাধিকার সহায়ক কল সেন্টার, ১৬৪৩০ সরকারি আইন সহায়ক কল সেন্টার দুস্থ ও দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ, ১০০ বিটিআরসি কল সেন্টার সেবা চালু রয়েছে;

- আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য এটুআই আর্থিক সেবাভুক্তি (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে;

- রুরাল ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে সারা দেশে প্রসার করতে এটুআই চালু করেছে 'এক-শপ' নামে একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড অ্যাসিস্টেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। দেশের সব শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা হয়েছে;

- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd) সব তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায়- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সব দপ্তরের সহযোগিতায় এটুআই বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি ওয়েবপোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বাস্তবায়ন করছে;

- প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া যার ঠিকানা (www.nothi.gov.bd);

- ই-নামজারি (www.land.gov.bd) বা ই-মিউটেশন উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের নামজারি সেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে, বিনা ভোগান্তিতে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রদানের জন্য ই-নামজারি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে;

- আরএস খতিয়ান (www.rsk.land.gov.bd) সিস্টেম ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আরএস খতিয়ানসমূহ অনলাইনে প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়;

- দেশের সব ভূমি রেকর্ডকে (খতিয়ান) ডিজিটাল করার উদ্দেশ্যে ‘ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড রুম সার্ভিস (ডিএলআরএস)’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;

- মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের হিসাব নির্ণয়ের জন্য (www.inheritance.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে;

- ফরমস বাতায়ন (www.forms.gov.bd) জনগণের দুর্ভোগ হ্রাসে সব সরকারি ফরম এক ঠিকানায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফরমস বাতায়নের সূচনা। বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ফরমস বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে;

- বিচার বিভাগীয় বাতায়ন (www.judiciary.org.bd) তৈরি করা হয়েছে;

- ইনোভেশন ফান্ড নাগরিক সেবা সহজীকরণে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় আর্থিক, কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে এবং বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের উদ্যোগসমূহে উদ্ভাবনী দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে ‘এটুআই ইনোভেশন ফান্ড’;

- অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (www.grs.gov.bd) চালু রয়েছে;

- টিকেট ক্রয়, নির্দিষ্ট ট্রেনে সিট প্রাপ্যতা, ভ্রমণ ইতিহাস, ট্রেন ট্র্যাকিং, কোচ ভিউ, খাদ্যদ্রব্যের অর্ডার, অভিযোগ দাখিল, ট্রেন সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য “রেলসেবা” মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে;

- ইলেক্ট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (www.echallan.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে;

- ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হয়;

- 'জাতীয় সঞ্চয় স্কীম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার আইবাস++ চলতি অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে;

- ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো-ই-টিআইএন,সার্টিফায়েড কপি অব রেকর্ডস, মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট ও ভাতা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইনে ট্যাক্স পেমেন্ট সিস্টেম ও রিটার্ন দাখিল, কাস্টমস হাউজ অটোমেশন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি ও রেজাল্ট, স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স, মৌজা ম্যাপ সরবরাহ, ডিজিটাল সার্ভিস এক্সেলেরেটর, সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ ইত্যাদি;

- ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর মানব সদৃশ রোবট সোফিয়ার উপস্থিতি বাংলাদেশে স্মরণকালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

- ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ প্রোগ্রামের আওতায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নেয়া পদক্ষেপের সুফলগুলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে (আইসিটি) মন্ত্রণালয় হয়ে উঠেছে সরকারের অন্যতম সক্রিয় মন্ত্রণালয়।

### (১১) ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি :

ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো আর্থিক খাতে লেনদেনে এটিএম বুথ, মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইনে পেমেন্টের ওপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা। ব্যাংক-এ

না গিয়ে ঘরে বসেই অসংখ্য গ্রাহক মোবাইলে পরিশোধ করছে ইউটিলিটি বিল। এটিএম বুথ ব্যবহার করে টাকা তুলে খরচ করছে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে কতটা সহজ করেছে তার উদাহরণ শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যে আন্ত:লেনদেন সম্পূর্ণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন করেছে। এ সিস্টেমে এটিএম বুথ, পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস), ইন্টারনেট, মোবাইল ব্যাংকিং করা হচ্ছে। এর মধ্যে সব ব্যাংকের মধ্যে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ ও কেনাকাটা চালু রয়েছে। এ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মাসে প্রায় ২১ লাখ চেক প্রসেসিং হচ্ছে। উপরন্তু ইলেকট্র্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরকার ও কর্পোরেট বডির মধ্যে বেশি অর্থের আদান-প্রদান চলছে। আর ই-কমার্স পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহক তার নিজ একাউন্ট থেকে অনলাইনে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজের একাউন্ট থেকে অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাউন্টে ট্রান্সফার করছেন। মোবাইল ব্যবহারকারীরা রেলওয়ের টিকিট, ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট কিনতে পারছেন। এ ছাড়া পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করছেন। প্রযুক্তির সুবাদে বিশ্বব্যাপী ব্যাংক খাতে চলছে দ্রুত পরিবর্তন। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এই পরিবর্তন ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহার করে ব্যাংকগুলো এখন আগের চেয়ে কম খরচে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে ও সেবা সরবরাহ কার্যকরভাবে করতে পারছে। বাড়াতে পারছে মুনাফা এবং একই সাথে বাড়াতে পারছে সেবার মান ও পরিধি। অধিকন্তু গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংকগুলো চালু করছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, কল সেন্টার, অ্যাপভিত্তিক ব্যাংকিং ইত্যাদি। নিম্নে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট এর প্রবৃদ্ধি ও চালু মোবাইল হিসাব এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো (সূত্র-বাংলাদেশ ব্যাংক) :

**টেবিল নম্বর ৩**
**মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট প্রবৃদ্ধির চিত্র।**

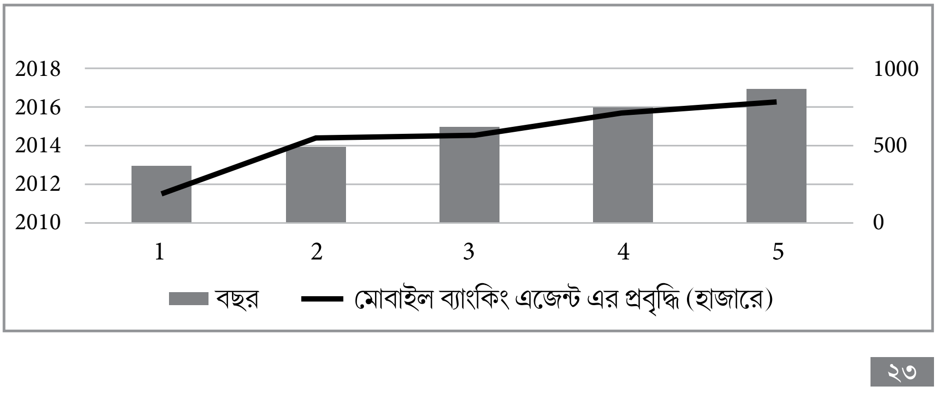

**টেবিল নম্বর ৩**

**মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট প্রবৃদ্ধির চিত্র।**

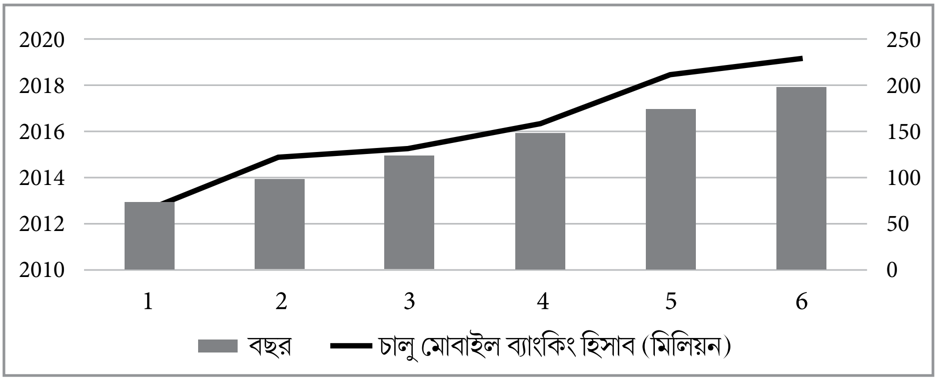


## (১২) প্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন সময়ে পুরস্কার অর্জন :

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভুমিকা পালন করায় ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ "দ্য গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়;

- ডিজিটাল সিস্টেম ও শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর ওয়াশিংটনে জাতিসংঘ সাউথ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান করা হয়;

- গভর্নিং প্রসেসকে ডিজিটাইজ করার জন্য Asian-Oceanian Computing Industry Organization তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগকে ASOCIO 2016 Digital Government Award প্রদান করে;

- ০৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাপানের টোকিওতে Digital Government Award ক্যাটাগরীতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে ASOCIO Digital Government Award ২০১৮ প্রদান করা হয়;

- ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে তাইওয়ানের তাইপেতে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরীতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে eASIA Award-2017 প্রদান করা হয়;

- আইসিটি এডুকেশন এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে WITSA Award 2017 প্রদান করা হয়;

- সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের ই-গভর্নমেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় ‘ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে Open Group Kochi Award ২০১৯ প্রদান করা হয়;

- আইসিটি’র উন্নয়ন এবং ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তির প্রধান সংগঠন এশিয়া-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অরগানাইজেশন কর্তৃক প্রবর্তিত ‘ASOCIO Award-2010’- এ ভূষিত করা হয়;

- বিসিসি দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১১ সালে e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি সহ মোট ২টি ভারতের Manthan Award 2011 অর্জন;

- হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭, ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন ২০১৩ সহ আরো অনেক পুরস্কার অর্জন;

- ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS Award) পুরস্কার অর্জন;

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও জীবন মানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে ICT Sustainable Development Award, Global ICT Excellence Award, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬, অ্যাসিসিও ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান করা হয়;

- ৭ থেকে ৯ মে ২০১৭ যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত MobileGov World

Summit 2017 শীর্ষক ইভেন্টে Excellence in Designing the future of e-Government ক্যাটাগরিতে তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ‘Global MobileGov Awards 2017’ এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়;

- Asian-Oceanian Computing Industry Organization এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ‘ICT Education Award 2017’ পুরস্কার প্রদান করা হয়;

- ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার প্রাপ্তি;

- যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৭এ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন;

- ইন্টারন্যাশনাল ইনভেশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন (আইটিইএক্স/ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ তে ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩টি পুরস্কার লাভ;

- এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বিসিসি। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ওপেন গ্রুপের শীর্ষ কর্মকর্তা বিসিসির প্রতিনিধির কাছে পুরস্কারটি হস্তান্তর;

- দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৮ এ একসেবা প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন;

- ইউএন ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট র‌্যাংকিং এ বাংলাদেশ ২০১২ সালে ১৪৮ তম অবস্থান থেকে ২০১৮ সালে ১১৫তম অবস্থান পৌঁছায়। তাছাড়াও টেলিকমিউনিকেশন সূচক এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল সূচকেও বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে।

দেশ ও সরকার যেমন পুরস্কার পাচ্ছে আন্তর্জাতিক ও দেশিও অঙ্গন থেকে, তেমনই

সরকারও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও সাধারণ জনগনের মাঝে তথ্য প্রযুক্তি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নিয়মিতভাবে পুরস্কার দিচ্ছে। উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অনেক ধরণের কাজ করেছে। প্রবন্ধের কলেবর ছোট রাখার স্বার্থে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

## বিশ্বে আমাদের অবস্থান

বর্তমান সরকারের ব্যবসা বান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বর্তমানে রপ্তানির পরিমাণ ১ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। সরকার আগামী ৫ বছরে আইসিটি খাতের রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ, ৯০ ভাগ সেবা অনলাইনে প্রদান, দেশের শতকরা শতভাগ জনগণকে কানেকটিভিটির আওতায় আনা এবং আরও ১ মিলিয়ন জনবলের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। জাপানের মতো উন্নত দেশের ১০ হাজার অ্যাপার্টমেন্টকে স্মার্ট করার কাজটা তারা আমাদের তরুনদের হাতে তুলে দিয়েছে ২০১৭ সালে। আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের তৈরি সফটওয়্যার ও আইটি সেবা আমরা সরবরাহ করছি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়েব পোর্টাল রয়েছে বাংলাদেশে। শিগগিরই তৈরি পোশাকশিল্পের চেয়ে আইটি বা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের রপ্তানি আয় বাড়বে। বাংলাদেশের অনেক তরুণ-তরুণী সফটওয়্যারের কাজ করে নিজের বেকারত্ব ঘুচিয়েছে; অন্যের কাজের সংস্থান করেছে এবং বিদেশ থেকে নিয়ে আসছে বৈদেশিক মুদ্রা। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যখন কম্পিউটার ব্যবহারে সাবলীল হয়ে উঠবে তখন বাংলাদেশকে আর তৈরি পোশাক শিল্পের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। কুটির শিল্পের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের কাজ করে দেশের মাটিতে বসে এ দেশের যুবসমাজ নিয়ে আসবে বৈদেশিক মুদ্রা।

## তথ্য প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ও ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক বাজার

সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগে ট্যাক্স হলিডেসহ নানাবিধ ইনসেনটিভ প্যাকেজ ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে। হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ করা হয়। আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রদান করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযেগিতায় স্ট্র্যাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ২০১৮ সালে আইসিটি রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিদেশি নানা ধরনের আন্তর্জাতিক ও কাষ্টমাইজড ইভেন্টের আয়োজনের ফলে আইসিটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারিগণকে উৎসাহী করা হচ্ছে। বি-টু-বি ম্যাচমেকিং এর ফলে স্বনামধন্য

বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে নানা ধরণের চুক্তির আওতায় দেশিয় আইটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে আইটি প্রোডাক্ট ও সার্ভিস রপ্তানীতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে বিদেশে বিশেষত আন্তর্জাতিক আইটি মার্কেটে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বা কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ব্যাপকতর বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির উদীয়মান খাতসমূহে কাজ করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে আইবিএম এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। শুধু প্রচলিত খাতেই নয়, অপ্রচলিত খাতকেও রফতানি নির্ভর খাতে পরিণত করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এখন বহুমুখী রফতানি খাত গড়ে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। খুঁজে বের করতে হবে সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে; যার ওপর ভিত্তি করে উন্নত দেশের দিকেই এগিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য সর্বাত্বক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। দেশে দেড় হাজারের বেশি আইটি ও আইটিইএস কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের প্রায় ৫শ’ কোম্পানি রফতানির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রফতানি খাত হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে (আইসিটি) বিবেচনা করছে সরকার। ২০২১ সালের মধ্যে এই খাত থেকে ৫০০ কোটি ডলারের (৪০ হাজার কোটি টাকা) পণ্য ও সেবা রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জিডিপিতে আইসিটির অবদান ৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া এবং ২০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য নিয়েও কাজ করছে সরকার। লক্ষ্য অর্জনে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, সারা দেশে হাইটেক পার্ক তৈরি, সফটওয়্যার রফতানি বাড়ানো, বিপিও খাতের উন্নয়ন, এক হাজার উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি, গেম খাতের উন্নয়নসহ বহুমুখী উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ এবং রফতানি আরও বাড়বে বলে আশা করছেন আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তারা। তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্জন ও সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমাদের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য খ্যাতি। যার প্রতিফলন দেখতে পাই বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের বক্তব্যে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতিতে। ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘বর্তমানে জিম্বাবুয়ে থেকে শুরু করে বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে  সব ক্ষেত্রে এ সব দেশে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।’ সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, ‘আমাদের প্রতিবেশী দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে।’ নিম্নে বছরওয়ারী সফটওয়ার রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হলো (সূত্র-এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো) :

**টেবিল নম্বর ৫**

**সফটওয়ার রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চিত্র।**

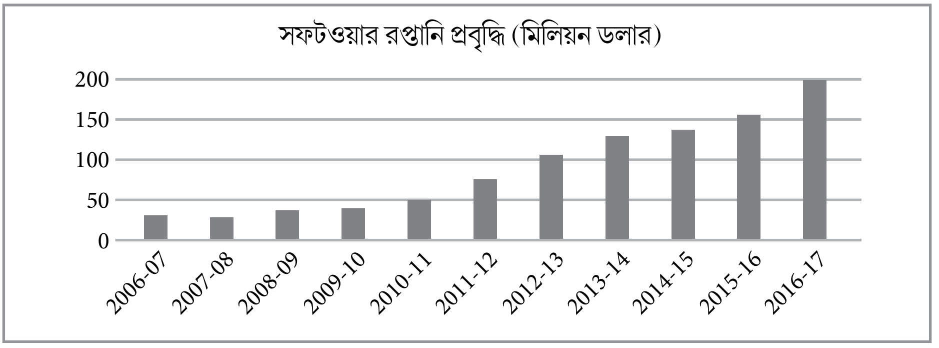


## ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

- ডিজিটাল প্রযুক্তির অন্যতম অবদান হল ইন্টারনেট। ইন্টারনেট ব্যবহার এখনো এখানে বেশ ব্যয় সাপেক্ষ এবং গতি কম । আর যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, তাদের বড় অংশ মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন । কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ওপর জোর দিতে হবে । ডেস্কটপে ইন্টারনেট সেবা বাড়াতে হবে। আর মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের নানা বিষয় ব্রাউজ করার সক্ষমতা বাড়াতে হবে;

- অনেক খাতই এখনো ডিজিটাল হয়নি। ব্যাংকিং খাতে অর্থ স্থানান্তরসহ নানা বিষয়ে অনলাইন সুবিধা পাওয়া গেলেও অনেক কিছুই এখনো চলে ম্যানুয়ালি । ঘরে বসে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না। অনেক খাতই আংশিক ডিজিটাল। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা এখনো ডিজিটাল হয়নি, যা খুবই জরুরি;

- ডিজিটাল বাংলাদেশ শতভাগ বাস্তবায়ন করা যাবে, সেক্ষেত্রে বড় বড় কাজে আরও বাজেট বাড়াতে হবে এবং বেশি বেশি এ কাজে আরও আগ্রহ তৈরী করতে হবে;

- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগণের দক্ষতা বাড়াতে হবে, যেন তারা তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে সহজেই কাজ করতে পারে;

- এ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

## সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা

তথ্য প্রযুক্তি খাতে আমাদের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে বিভিন্ন সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ব্যবহারে মনোযোগ দেয়া ও এটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কোনো বিকল্প বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। আমাদের সবাইকেই যে যার প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে। সরকার জাতীয়ভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো :

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙ্গে ২০২০ সালের মধ্যে ৮% এ উন্নীত করা এবং বিনিয়োগের হার জিডিপির ৩৪.৪০% এ উন্নীত করা;
- টেলিযোগাযোগ খাতে ২০২০ সালের মধ্যে টেলিডেনসিটি ১০০% এ উন্নীত করা;
- ২০২০ সালের মধ্যে ইন্টারনেট পেনিট্রিশন হার ১০০% এ উন্নীত করা;
- ২০২০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০০% নীট এনরোলমেন্ট করা;
- ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ২০২১ সালে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০% থেকে ১৫ শতাংশে নেমে আসবে;
- ২০২১ সালে কৃষিখাতে শ্রমশক্তি ৪৮ % থেকে কমে দাঁড়াবে ৩০%;
- ২০২১ সাল নাগাদ বর্তমান দারিদ্রের হার ৪৫% থেকে ১৫% নামবে;
- ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা হবে;
- ২০২১ সালে তথ্য - প্রযুক্তিতে' ডিজিটাল বাংলাদেশ ' হিসেবে পরিচিতি লাভ;
- ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলোক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্য নিশ্চিত করা হবে;
- ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে ;

- ২০২১ সালে গড় আয় ৭০ এর কোঠায় উন্নীত হবে;
- শিশু মৃত্যুর হার ৫৪ থেকে ১৫ % এ নামিয়ে আনা হবে ;
- গবেষণা ও উন্নয়ন খাতের ব্যয় বর্তমান জিডিপি ০.৬% হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- ২০২০ সালের মধ্যে ১০০% ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা;
- ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক জিডি ও এফআইআর নিশ্চিত করা;
- ২০২১ সালের মধ্যে ৪০% ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নিশ্চিত করা;
- টেকনোলজি ল্যাব অ্যান্ড সফটওয়্যার ফিনিশিং স্কুল, মর্ডানাইজেশন অব রুরাল অ্যান্ড আরবান লাইভস্, স্মার্ট সিটি প্রকল্প, ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্নমেন্ট প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিএলএসআই ল্যাব, জাতীয় নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ফরেনসিক ল্যাব,আইটি পার্ক ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট,ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একাডেমি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি সেন্টার, জাতীয় সার্টিফিকেশন পদ্ধতি, জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি, ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি অব মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ইনোভেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হবে;
- একটি দেশকে ডিজিটাল রূপান্তরের অর্থ হলো তাকে একটি ইস্টেট পরিবর্তন করা। অর্থাৎ দেশটির শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি পরিচালনায় কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ই-লার্নিং, ই-গভর্নেন্স, ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের;
- দেশে ২০২০ সাল শেষে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে মোট মোবাইল ব্যবহারকারীর ৪৯ শতাংশে উন্নীত হবে। এই হার ২০১৬ সালের শেষে ছিল প্রায় ২২ শতাংশ;
- প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার বৃদ্ধির সুবাদে উৎপাদনশীলতা বাড়বে বলে আশা

করা যায়। এ ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে, প্রতিটি নতুন প্রযুক্তির জন্যই নতুন প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশকে ডিজিটাল করে তুলতে হলে প্রশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিক্ষাসহ সব খাতেই আরও অধিক হারে স্মার্ট মেশিন ও প্রক্রিয়াগত সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন।

## উপসংহার

বাঙালী জাতি তার স্বাধীনতা অর্জনের সাড়ে চার দশকেরও বেশি পথ চলায় প্রযুক্তির পূর্নাঙ্গ ব্যবহার করতে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছে বা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার কথা বলেছে সেটি মোটেই কেবল একটি স্লোগান নয় বরং তা আজ দৃশ্যমান। দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা, গ্রামে তথ্য প্রযুক্তির মহাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ জন্য জনগনের সেবা  দ্রুততার সাথে প্রদান করা যাচ্ছে। চলমান প্রক্রিয়ার সাথে সারাদেশে কম্পিউটারের সঙ্গে অনলাইন বা ইন্টারনেট আরও বেশী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। মোটকথা উন্নয়নের জন্য সরকার এবং জনগনের যৌথভাবে কাজ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে অবদান রাখতে হবে। সার্বিকভাবে তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে নেয়া উদ্যোগগুলোর ফল ইতিমধ্যে আমরা পেতে শুরু করেছি, যা ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে । বিগত দশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রযুক্তি ভিত্তিক তথ্য ও সেবা পৌঁছে গেছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। বিশেষজ্ঞরা তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক এই অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আখ্যায়িত করছেন ডিজিটাল রেনেসাঁ বা ডিজিটাল নবজাগরণ হিসেবে। বাঙালী হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবের বিষয়টি এক সময় আমাদের কাছে সোনার হরিণ বলে মনে হতো। কিন্তু সময়ের পালা বদলের ধারায় বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বিপ্লবের নবদিগন্তের সূচনা করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘শিক্ষা মানুষকে কেবল শিক্ষিতই করে না, বরং গৌরবান্বিতও করে।’ এ কথার নেপথ্যে যে গভীর অর্থটি লুকিয়ে আছে তা হলো-শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞান মানুষ ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশকে বিকশিত করবে। এর মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিই গৌরবান্বিত হবে না, দেশও গৌরবে অভিষিক্ত হবে। বর্তমান সরকার মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ডিজিটাল আইল্যান্ড ও ফোর জি সেবা চালুর প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার স্বল্প সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়েছে, যার সুফল গ্রামের মানুষও ভোগ করছে। হাইটেক পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে সরকার প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রজন্ম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যারা ডিজিটাল বাংলাদেশের

স্বপ্ন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি বিশ্লেষনে এটা অকপটে বলা যায় যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ (এসডিজি) অর্জন করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উন্নত দেশ।

## পাদটীকা/তথ্যপঞ্জি :

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়ন ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন এর ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪। গত ১০ জুলাই ২০১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইট এ প্রকাশিত ''শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার ১০ বছর" লেখা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭। এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিটিআরসি হতে সংগৃহীত।

৮। বেসিসি এর ওয়েবসাইট সহায়তা নেয়া হয়েছে।

৯। মাসিক কম্পিউটার জগৎ হতে সংগৃহীত তথ্য।

১০। এছাড়াও গত ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকা, গত ২৩-০৫-২০১৯ ও ০৬-০৫-২০১৮ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো, গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সময়, গত ১৯-০১-২০১৮ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ভোরের কাগজ, গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক উত্তেফাক, গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর, গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব, অনলাইন

বাংলা উইকিপিডিয়া, ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অর্জন বিসিসি এর প্রকাশিত প্রতিবেদন হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১। এছাড়াও গুগল, ক্রোম এর সহায়তা নেয়া হয়েছে।

# তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: প্রয়োগ বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ড. জিল্লুর রহমান পল*

**Abstract**

Information is power. It is one of the tools of ensuring corruption free society. Free flow of information ensures transparency and accountability. It is guaranteed by the constitution of the People's Republic of Bangladesh. Therefore, it is the government obligation to ensure good governance in all offices. Realizing it, the government enacted an effective and pro-people law titled 'Right to Information, 2009' (RTI) through which government, semi-government and autonomous bodies are bound to provide information to the seeker. The article has attempted to analyze critically the current implementation reality of the act, its challenges and remedies. Analyzing the reatlity, it can be said that the implementation of this act could not reach to expected level because of having small amount of application compare to huge population of the country. Some of the challenges viz. poor knowledge on RTI, culture of secrecy, poor management of information etc. are identified here. To overcome these challenges, increasing of mass awareness on RTI, publicity, ensuring the digital information management system, maximum self-disclosure of information and adequate quality training on RTI to designated officer and appeal authority etc. could be done.

## ১. ভূমিকা

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির যুগ। মানুষের পাশে শুধু তথ্যের প্লাবন। অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স হিসেবে তথ্য হলো তা, যা মানুষের অনিশ্চয়তা দূর করে। তথ্য প্রাণ – আধুনিক রাষ্ট্রের; তথ্য অক্সিজেন – গণতন্ত্রের; তথ্যহীন থাকা মানে সন্দেহে থাকা; অনিশ্চয়তায় বসবাস (দাশ ও ফেরদৌস, ২০০৭)। তথ্যের মহাসড়ক ধরে মানুষের প্রতিদিনের পথচলা। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে সে তত শক্তিশালী (রহমান, ২০১০)। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. আ

* সহকারী অধ্যাপক, ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

আ স স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'তথ্য এক ধরনের সম্পদ। জনগণের মধ্যে এটা যত ছড়ানো যাবে, জনগণ তত সমৃদ্ধ হবে। তথ্যের পরিপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। প্রতিটি উন্নত দেশের দিকে তাকালেই এ সত্যই উপলব্ধি করতে পারবো' (ফেরদৌস ও রহমান, ২০০৮)। দেশের গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের এমন উপলব্ধি দীর্ঘকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশন সুপারিশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় (তথ্য কমিশন, ২০১০)। দেশের আইন-বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিতি সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা তথা সকল ধরনের দপ্তরের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবিধানের অন্যতম মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে (আহমদ, ২০১৯: ৩)। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কর্তৃপক্ষের যে তথ্যগুলো কাজে লাগে আর তা যদি না পাওয়া যায়, তবে এই আইনের অধীনে সেসব তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করা যায় এবং তা প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

তথ্য চাওয়ার, পাওয়ার ও প্রকাশের বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির নাগরিক অধিকার। জানার অধিকার মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। তথ্য জানানো তো আর নিছক তথ্য জানানোর জন্য নয় বরং তথ্যের রয়েছে বিরাট এক সামাজিক উপযোগিতা। এর বিজড়ন তাই বিচিত্র ও বহুবিধ। ক্রেতা হিসেবে যেমন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে খাবারের প্যাকেটে খাদ্য উপকরণ, খাদ্যগুণ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানা; কৃষকের অধিকার রয়েছে নতুন বীজ, সার আর সেচ পদ্ধতির খবর জানার। কাজেই তথ্য জানার গুরুত্ব রাষ্ট্র জীবন, সমাজ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনেও পরিব্যাপ্ত (ফেরদৌস ও রহমান, ২০০৮)। অর্থাৎ, মানুষ নানা কারণে তথ্য চায়। তাঁর প্রয়োজনেই বিভিন্ন তথ্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে জীবনব্যাপী। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই জীবনের নানা সমস্যা-সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি-প্রত্যাশা গভীরভাবে অনুভূত হয়। অন্য কথায়, নাগরিক জীবনকে ঘিরে যত সব আয়োজন, যত কিছুর প্রয়োজন, সবই তথ্যের কারণেই অর্থবহ হয়ে উঠে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এ তথ্যের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে,

> "'তথ্য' অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে

কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না” (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯)।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে বর্ণিত সংজ্ঞা মতে তথ্য প্রদান করা দেশের সকল সরকারি- বেসরকারি দপ্তর তথা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। আইনটি ২০০৯ সালের ০১ জুলাই কার্যকর হওয়ার পর প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হতে চলছে। কিন্তু এ আইনের প্রয়োগ বাস্তবতা কেমন বা বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদানও সমভাবে জরুরি। আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে এ বিষয়গুলোকে অ্যাকাডেমিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস (যেমন- বই, জার্নাল, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেন, ওয়েবপেজ, সংবাদপত্র, প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি) থেকে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। গবেষকের পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে নিবন্ধটি রচিত হয়েছে।

## ২. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কী

### ২.১ *সংবিধানের চেতনা ও তথ্য অধিকার আইন*

তথ্য অধিকার আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের মূল চেতনার সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সংবিধানের ৭(১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে’ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-৭)। জনগণ মালিক হলে তার সেবায় নিয়োজিত কর্মচারীগণের জবাবদিহিতা থাকা আবশ্যক যা তথ্য অধিকার আইনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে’ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-১১)। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অবাধ তথ্য প্রবাহ একটি পূর্বশর্তস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, রাষ্ট্রের তথ্যের প্রবাহ অবাধ হলে, গণতন্ত্রের পূর্বশত যা, ঠেকানো যায় এমনকি দুর্ভিক্ষও (তথ্য কমিশন, ২০০৯)। অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারও নিশ্চিত হয়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার অনেকটা গ্যারেন্টি দেয়া হয়েছে। এ আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, ‘প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ একজন নাগরিককে

তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে' (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯)। এ ছাড়া সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের ভাবনা-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বা গণমাধ্যমে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ না থাকার বিষয়টি সংবিধান স্বীকৃত। তথ্য অধিকার আইন মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার বাধাকে দূর করে তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এ আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

ক) নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;

খ) সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো;

গ) দুর্নীতি হ্রাসকরণ;

ঘ) সুশাসন নিশ্চিতকরণ;

ঙ) প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং

চ) অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রস্তাবনায় আইনের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে সংবিধানের চেতনার সাথে বর্ণিত বিষয়গুলোর আলোকপাত করা হয়েছে।

## ২.২ *তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সার-সংক্ষেপ*

তথ্য অধিকার আইনটি ২০০৯ সালের ২০ নং আইন যা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাস হয় ২৯ মার্চ ২০০৯ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ০৫ এপ্রিল ২০০৯। গেজেট আকারে প্রকাশ হয় ০৬ এপ্রিল ২০০৯ এবং কার্যকর হয় একই বছরের ০১ জুলাই থেকে। তথ্য কমিশন গঠন হয় ০১ জুলাই ২০০৯। এ আইনে ০৮টি অধ্যায় এবং ৩৭টি ধারা রয়েছে। সংক্ষেপে অধ্যায়গুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ:

- প্রথম অধ্যায়- প্রারম্ভিক: এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন, বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও আইনের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

- দ্বিতীয় অধ্যায়- তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি: এই অধ্যায়ে তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রকাশ, কোন কোন তথ্য প্রকাশ বা প্রদান

বাধ্যতামূলক নয়, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, তথ্য প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি বর্ণিত আছে।

- তৃতীয় অধ্যায়- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: এ অধ্যায়ে প্রত্যেক অফিসে তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োজন ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

- চতুর্থ অধ্যায়- তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি: এ অধ্যায়ে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, তথ্য কমিশন গঠন, তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ ইত্যাদি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ, তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি, তথ্য কমিশনের সভা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত রয়েছে।

- পঞ্চম অধ্যায়- তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি: এ অধ্যায়ে তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি, বাজেট, তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা, হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।

- ষষ্ঠ অধ্যায়- তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী: এ অধ্যায়ে তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

- সপ্তম অধ্যায়- আপিল, অভিযোগ ইত্যাদি: এ অধ্যায়ে আপিল নিষ্পত্তি, অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, প্রতিনিধিত্ব, জরিমানা, Limitation Act ১৯০৮, মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

- অষ্টম অধ্যায়- বিবিধ: সর্বশেষ অধ্যায়টিতে তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ, কতিপয় সংস্থা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের প্রয়োগ অব্যাহতি, বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা, অস্পষ্টতা দূরীকরণ, মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ, রহিতকরণ ও হেফাজত ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

- এ ছাড়া তথ্য অধিকার আইন (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা ২০১১ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০ জারি করা হয়েছে।

### ২.৩ কীভাবে তথ্য সেবা পাওয়া যায়

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারি- বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছে যিনি জনগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমগুলো অনুসরণপূর্বক কাঙ্খিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণ করে সরবরাহ করবেন। সাধারণত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ বা ক্ষেত্রমতে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল এবং সে ক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারি ও শুনানি গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তরকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করতে হয় এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানি আদালতের মতো তথ্য কমিশন কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোনো কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের তথা দপ্তরের নিকট সুপারিশ করতে পারে এবং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারে (রফিকুজ্জামান, ২০১৬)।

## ৩. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রয়োগ বাস্তবতা বিশ্লেষণ

প্রকৃতপক্ষে তথ্যের অধিকার ছাড়া সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অকল্পনীয়। তথ্য অধিকার, তথ্যের আদান-প্রদান এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকার আইনের মূল দর্শন মূলত এগুলোই। এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। সব উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টনির তথ্য জনগণকে জানাতে হবে, জনগণের এসব অধিকারের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক। তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ, অরক্ষিত ও প্রান্তিক জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই তথ্য অধিকারকে বলা হয় 'Right of all rights'। এটি সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদের পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার আইনটি সর্বজনীন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে, জনগণকে সব কাজে অংশগ্রহণের

অধিকার দেয়, উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসে। এটি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের মূল চেতনারই প্রতিফলন (আহমদ, ২০১৮)।

তথ্যই শক্তি আর তথ্যে প্রবেশাধিকার ক্ষমতায়ন মানে জনগণের ক্ষমতায়ন। অন্যদিকে সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদ মতে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)। বিশ্বব্যাপী কর্তৃপক্ষের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে – বলা যায় 'paradigm shift' হয়েছে। নাগরিকের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দ্রুত ও নির্ঝঞ্ঝাট সেবা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি কর্তৃপক্ষকে তাই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA- Annual Performane Agreement), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS- National Integrity Strategy), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS- Grievance Redress System), ওয়ান স্টপ সেবা (One Stop Service), উদ্ভাবন (Innovation), ডিজিটাল বাংলাদেশ এর চর্চা করতে হচ্ছে। এ সব কাজে সফলতার পূর্বশর্ত হলো অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ (প্রাগুক্ত)। তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রচলিত অন্য কোন আইনের – (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হইবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে'। এ ছাড়া ৬(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না' (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯)। অর্থাৎ, জনগণের ক্ষমতায়নে আইনটি তাৎপর্যরূপে প্রণীত হয়েছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' এর মূলনীতি No one will be left behind বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সমাজের সব ক্ষেত্রে অসমতা নিরসনের মূলে কাজ করতে পারে তথ্য ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার। সব ধরনের দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই কৃষি, সকলের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, অসমতার নিরসন, পরিমিত ভোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ এবং অংশীদারত্ব ইত্যাদি হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬.১০ লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে, 'জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান'

(সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ২০১৭)। তথ্য অধিকার আইনটি বর্ণিত অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার পরিপূরক। শুধু এটি নয়; মুক্ত সমাজ ও জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, ভোটাধিকার, অসমতা-বৈষম্য-বঞ্চনার অবসান, নারীর ক্ষমতায়ন, শ্রেণি বৈষম্য নিরসন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের মূল বিবেচ্য বিষয় হলো তথ্যে প্রবেশাধিকার। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রয়োগ এসব অর্জনের সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে পারে।

কিন্তু গত প্রায় এক যুগে আইনটির সঠিক পথ-নির্দেশনা প্রদানের বাস্তবতা কেমন তা নিয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তথ্য কমিশনের বিগত ০৩ বছরের (২০১৬-২০১৮) প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের আলোকে বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

### *৩.১ তথ্যের জন্য দাখিলকৃত আবেদন*

তথ্য কমিশনে বিগত ০৩ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সারা দেশে বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চেয়ে মোট আবেদন পড়েছে ২৩ হাজার ১৯৬টি যার প্রায় ৯৪% ভাগ আবেদনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন প্রায় ৯৬% যা সংখ্যায় ২২ হাজার ২১৫টি আর এনজিও/ বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট মাত্র প্রায় ৪% তথা ৯ শত ৮১টি। নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিপুল তথ্য চাহিদার বিপরীতে আবেদনের সংখ্যা খুবই বেশি নয়। প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশে এত কম সংখ্যক তথ্য চেয়ে আবেদন আশাব্যঞ্জক নয়। ঠিক এ ধরনের একটি চিত্র ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে। টিআইবি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১০ বছরে তথ্য অধিকার পাওয়ার জন্য ৯৯ হাজার ২৩৮টি আবেদন জমা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় খুবই সামান্য। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিংয়ে ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২৬তম অবস্থানে রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় (জাগোনিউজ২৪.কম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। তবে আশার চিত্র হলো গত তিন বছরে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রায় ৯৪% ভাগ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। যেসব তথ্য দেয়া হয়নি তার মধ্যে প্রক্রিয়াধীন আবেদন রয়েছে। বিষয়টি সরকারি- বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মানসিকতার পরিবর্তনে একটি ইঙ্গিত বহন করে।

**সারণি-৩.১.১: তথ্যের জন্য দাখিলকৃত আবেদন সংখ্যা ও তথ্য প্রদানের হার**

| সময় | মোট আবেদন সংখ্যা | কর্তৃপক্ষওয়ারি আবেদন সংখ্যা | | তথ্য প্রদানের সংখ্যা ও হার |
|---|---|---|---|---|
| | | সরকারি | এনজিও/ বেসরকারি | |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | ৬,৩৬৯ | ৬,১৭২ (৯৬.৯১%) | ১৯৭ (৩.০৯%) | ৬,০৮২ (৯৬.৫০%) |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | ৮,১৬৭ | ৭,৭৬৮ (৯৫.১১%) | ৩৯৯ (৪.৮৯%) | ৭,৮০৮ (৯৫.৬০%) |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ | ৮,৬৬০ | ৮,২৮৫ (৯৬.৫৬%) | ৩৮৫ (৪.৪৪%) | ৮,০০৮ (৯২.৪৭%) |
| সর্বমোট | ২৩,১৯৬ | ২২,২১৫ (৯৫.৭৭%) | ৯৮১ (৪.২৩%) | ২১,৮৯৮ (৯৪.৪০%) |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮। বন্ধনীতে শতকরা হার নির্দেশিত)

## ৩.২ *তথ্য না পেয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল*

নিচের সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বিগত ২০১৬-১৮ মেয়াদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য না পেয়ে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান বা আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিলের মোট সংখ্যা ৭ শত ৮৯টি। যার মধ্যে ৯২% ভাগই আপিল কর্তৃপক্ষ নিষ্পত্তি করেছে আর মাত্র ৮% ভাগ আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষকে আপিল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করতে হয়। তবে প্রতি বছর আপিলে সংখ্যা বৃদ্ধি নেতিবাচক তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ এতে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পেশাদারিত্বের ঘাটতি সহ অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। কারণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রত্যাখ্যাত বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলেই আপিলের বিষয়টি আসে।

**সারণি-৩.২.১: তথ্য কমিশনে আপিল সংক্রান্ত তথ্যাদি**

| সময় | আপিলে সংখ্যা | আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা | প্রক্রিয়াধীন আপিলের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | ২০১ | ১৮৩ | ১৮ |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | ২৩৩ | ২১৫ | ১৮ |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ | ৩৫৫ | ৩২৭ | ২৮ |
| সর্বমোট | ৭৮৯ | ৭২৫ (৯২%) | ৬৪ (৮%) |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮)

### *৩.৩ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের*

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য না পেলে নাগরিকগণ আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল আবেদন করতে পারেন। আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতেও তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায়। তথ্য অধিকার আইনের ১৩ এবং ২৫ ধারার আওতায় কমিশন অভিযোগসমূহ আমলে নেয়া, শুনানি গ্রহণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও নিষ্পত্তি করে থাকে। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত কমিশনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মোট ২ হাজার ৯৪৪টি অভিযোগ দায়ের করেছে। ২০১৭ সাল ব্যতীত অন্যান্য বছরে অভিযোগ দায়েরের হার ঊর্ধ্বমুখী। বিষয়টি ইতিবাচক নয়। কারণ, আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য না পেলেই তবে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায়। এতে জনগণের ভোগান্তি বাড়ে। অর্থাৎ, এখানে আপিল কর্তৃপক্ষের পেশাদারিত্বের ঘাটতি সহ অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। আবার ২০১৮ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে প্রায় ৬৩% ভাগ অভিযোগ (তথ্য কমিশন, ২০১৮)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আপিল করার বিধি বা পুরো আইন সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নন। তাই বিপুল সংখ্যক অভিযোগ শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি।

**সারণি-৩.৩.১: তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত তথ্যদি**

| সাল | মোট অভিযোগ | শুনানির জন্য গৃহীত | শুনানির জন্য গ্রহণের হার |
|---|---|---|---|
| ২০০৯-২০১৪ | ৮০৭ | ৪২৪ | ৫২.৫৪% |
| ২০১৫ | ৩৩৬ | ২৪০ | ৭১.৪৩% |
| ২০১৬ | ৫৩৯ | ৩৬৪ | ৬৭.৫৩% |
| ২০১৭ | ৫৩০ | ৪০৩ | ৭৬.০৪% |
| ২০১৮ | ৭৩২ | ৪৩৮ | ৫৯.৮৪% |
| সর্বমোট (২০০৯-২০১৮) | ২,৯৪৪ | ১,৮৬৯ | ৬৩.৪৯% |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৮: ৯৩)

### *৩.৪ জনগণ কর্তৃক যাচিত তথ্যের প্রকৃতি*

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় কী ধরনের তথ্য কর্তৃপক্ষ প্রদান করতে বাধ্য তা বর্ণিত রয়েছে। কমিশনের প্রথম দিকে বিশেষ করে ২০১০ এবং ২০১১ সালে প্রণীত প্রতিবেদনে মাঠ পর্যায়ে কী ধরনের তথ্য জনগণ চেয়েছে তার প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে এটি দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত চিত্র পাওয়া খুবই দুষ্কর যা অবাধ তথ্যের প্রবাহ পথে একটি বাধা। কারণ, তথ্য অধিকার আইনের মূল চেতনা হলো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন। যাচিত তথ্যের প্রকৃতি জানতে পারলে আইনটির সঠিক চর্চা হচ্ছে কীনা সে সম্পর্কে সহজেই জানা সম্ভব হয়। তাই প্রতিবেদনে যাচিত তথ্যের প্রকৃতি থাকা উচিত বলে মনে হয়। তবে তথ্য কমিশনে যেসব তথ্য না পেয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় তা থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। কমিশনের ২০১৮ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ রয়েছে। আবার ২০১৬ এবং ২০১৭ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বিষয়টি উল্লেখ নেই। কমিশনের ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২০ ধরনের তথ্য না পেয়ে জনগণ কর্তৃক দায়েরকৃত ৪৩৮টি অভিযোগ শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে (তথ্য কমিশন, ২০১৮: ১০১-১০৪)।

বেসরকারি সংস্থা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (RIB) বিগত ২০০৯-২০১০ সালের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। সেখানে বলা হয় জনগণ যেসব তথ্যের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে তার বেশির ভাগই তথ্য অধিকার আইনের মৌল যে উদ্দেশ্য – সরকার ও এনজিওদের কাজে স্বচ্ছতা

ও জবাবদিহিতা তৈরি করা, দুর্নীতি হ্রাস করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা- তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় (রিইব, ২০১১)। যেমন বিপুল সংখ্যক আবেদন পড়েছে কীভাবে বন্দুকের লাইসেন্স পাওয়া যায়, কীভাবে ব্যাংকে একাউন্ট খোল যায়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরে কী ধরনের সেবা পাওয়া যায় ইত্যাদি। এসব কোনো গোপন তথ্য নয় বা এর সঙ্গে দুর্নীতি বা জবাবদিহিতার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। এ তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারেরও প্রয়োজন পড়ে না (ফেরদৌস, ২০১১)। কিন্তু সম্প্রতি এ অবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, ১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত তথ্য কমিশন যেসব অভিযোগ শুনানি করেছে তার মধ্যে ভূমি, বিসিএস পরীক্ষা, দরপত্র, কমিশনের সিদ্ধান্তকে আমলে না নেয়া, প্রকল্প, ব্যাংক ঋণ, বরাদ্দ, প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটের কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হতে শুরু হয়েছে। তবে তা কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলা যাবে না।

**সারণি-৩.৪.১: তথ্য কমিশনে শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের যাচিত তথ্যের প্রকৃতি**

| যাচিত তথ্যের ধরন | অভিযোগের সংখ্যা* |
|---|---|
| ভূমি সংক্রান্ত | ৩৯ |
| বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্ত | ৩০ |
| দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক তথ্য | ২৯ |
| তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়া সংক্রান্ত | ২৬ |
| চাকুরি নিয়োগ সংক্রান্ত | ২২ |
| তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আংশিক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত | ২০ |
| ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত | ১৪ |
| নির্মাণ সংক্রান্ত | ১২ |
| প্রকল্প সংক্রান্ত | ১২ |
| এলজিএসপি বরাদ্দ/ব্যয় সংক্রান্ত | ১২ |
| নিয়োগ সংক্রান্ত | ১১ |
| মামলা সংক্রান্ত | ১১ |
| দরপত্র সংক্রান্ত | ১০ |
| বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত | ০৮ |

| | |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত | ০৭ |
| জরিপ/সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত | ০৪ |
| থানায় অভিযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় | ০৪ |
| মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও তালিকা সংক্রান্ত | ০৪ |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৮: ১০১-১০৪। * ন্যূনতম ০৪টি অভিযোগের সংখ্যা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।)

### *৩.৫ এনজিওতে তথ্যের জন্য আবেদন*

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে এদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও এর ভূমিকা রয়েছে। নাগরিক সমাজের সাথে এনজিও কাজ করেছে জনমত তৈরিতে বা চাপ সৃষ্টিতে। তবে এনজিওদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে সব সময়ই সাধারণ মানুষের মাঝে কৌতুহল রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার বা বিদেশ থেকে অর্থ এনে কীভাবে ব্যয় করা হয় বা পরিচালনা ব্যয় কত ইত্যাদি সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে সব সময়ই আলোচনা ছিল। এ সম্পর্কে এক সময় সঠিক তথ্য পাওয়া যেত না। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিগত ৩ বছরে (২০১৬-২০১৮) এসব এনজিওতে তথ্য চেয়ে মোট ৯ শত ২৮টি আবেদন করা হয়েছে যার মধ্যে ৮ শত ৮৬টি আবেদনের তথ্য দেয়া হয়েছে যা ৯৫% ভাগ। বিশেষ করে ২০১৭ সালে যাচিত তথ্যের সবই দেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রতি বছর এ সংখ্যা বাড়ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৬ সালে মাত্র ১৪টি, ২০১৭ সালে ১৩টি এবং ২০১৮ সালে ০৪টি এনজিওতে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন পেয়ে তথ্য প্রদান করেছে টিআইবি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর তথ্য মতে, জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত এদেশে ২ হাজার ৫০১টি এনজিও কাজ করছে (www.ngoab.gov.bd)। এর তুলনায় তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা প্রত্যাশাব্যঞ্জক নয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক মুহাম্মদ লুৎফুল হক মনে করেন, 'আইন প্রণয়নের পর এনজিও ও সুশীল সমাজকে খুব একটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না, যদিও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে এদেরই ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। রাজধানী ও বড় শহরকেন্দ্রিক কয়েকটি এনজিও তথ্য অধিকার নিয়ে কিছু তৎপরতা দেখালেও সার্বিক বিবেচনায় তা অতি নগণ্য। এনজিওদের নিস্পৃহ হওয়ার প্রধান কারণ তথ্য অধিকার আইন তাদের জন্যও প্রযোজ্য, যা তাদের কাছে কাম্য ছিল না' (হক, ২০১৩)।

**সারণি-৩.৫.১: এনজিও তে তথ্যের জন্য আবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি**

| সময় | তথ্যের জন্য আবেদন সংখ্যা | তথ্য প্রদানের সংখ্যা | তথ্য না দেয়ার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | ১৯৭ | ১৯২ | ০৫ |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | ৩৪৬ | ৩৪৬ | - |
| ০১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ | ৩৮৫ | ৩৪৮ | ৩৭ |
| সর্বমোট | ৯২৮ | ৮৮৬ (৯৫%) | ৪২ (৫%) |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮)

## *৩.৬ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ০৫টি মন্ত্রণালয়*

তথ্য চেয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আবেদনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিগত ০৩ বছরে (২০১৬-১৮) সরকারের ০৯টি মন্ত্রণালয় ঘুরে ফিরে সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্তির ০৫টি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলো হলো কৃষি, অর্থ, এলজিআরডি এন্ড সি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক, জনপ্রশাসন, পরিকল্পনা, শিক্ষা, শিল্প এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। নিচের সারণি থেকে দেখা যায়, এদের মধ্যে কৃষি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি এন্ড সি) মন্ত্রণালয় প্রতিবছর সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ০৫টির মধ্যে রয়েছে। তবে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেই সবচেয়ে বেশি তথ্য চাওয়া হয়েছে এবং এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে আবেদনপ্রাপ্তির শীর্ষস্থানে ছিল। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে জনপ্রশাসন এবং এলজিআরডি এন্ড সি মন্ত্রণালয়। কৃষি যে অর্থনীতির মূল প্রাণ বা কৃষি কেন্দ্রীক আমাদের জীবন ব্যবস্থা তা নাগরিকের তথ্য চাওয়ার বিষয় থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়।

**সারণি-৩.৬.১: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়**

| সময় | মন্ত্রণালয়ের নাম ও অবস্থান | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম |
| ২০১৬ | কৃষি মন্ত্রণালয় (৫৯৯টি) | অর্থ মন্ত্রণালয় (৫২৬টি) | এলজিআরডি এন্ড সি (২৭৮টি) | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০৭টি) | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (১২১টি) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৭ | কৃষি মন্ত্রণালয় (৭০১টি) | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (৫০৬টি) | এলজিআরডি এন্ড সি (২২৫টি) | শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১১৪টি) | শিল্প মন্ত্রণালয় (১১০টি) |
| ২০১৮ | **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (১৬০০টি)** | কৃষি মন্ত্রণালয় (৮৯৫টি) | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (৩১৮টি) | এলজিআরডি এন্ড সি (২৩৯টি) | পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১৯০টি) |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮। বন্ধনীতে আবেদনের সংখ্যা)

### ৩.৭ *সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ০৫টি জেলা*

বিগত ২০১৬-১৮ মেয়াদে যেসব জেলায় সবচেয়ে বেশি তথ্য চেয়ে আবেদন পড়েছে তার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১১টি জেলা ঘুরে-ফিরে শীর্ষ ৫টি অবস্থানে রয়েছে। জেলাগুলো হলো দিনাজপুর, কুমিল্লা, নীলফামারী, সিলেট, গাজীপুর, যশোর, বরিশাল, ঢাকা, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুর। এর মধ্যে সবেচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে নীলফামারী এবং এরপর কুমিল্লা জেলায়। নীলফামারী প্রতিবছর ২য় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। দিনাজপুর ২০১৭ এবং ২০১৮ তে শীর্ষস্থানে রয়েছে। নিচের সারণি থেকে এটি স্পষ্ট যে, বর্ণিত জেলাগুলোর জনগণ অন্যান্য জেলার চেয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বেশি সচেতন রয়েছে বা ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী।

**সারণি-৩.৭.১: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত জেলা**

| সময় | জেলার নাম ও অবস্থান | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম |
| ২০১৬ | কুমিল্লা (৮২৮টি) | নীলফামারী (৮০৮টি) | সিলেট (২৪৯টি) | গাজীপুর (২১৩টি) | যশোর (২০২টি) |
| ২০১৭ | দিনাজপুর (৪৪৩টি) | নীলফামারী (৩৭৩টি) | সুনামগঞ্জ (৩২৭টি) | বরিশাল (২৭৮টি) | রাজশাহী (১৮৪টি) |
| ২০১৮ | দিনাজপুর (৩৬০টি) | নীলফামারী (৩৪৬টি) | সিলেট (২৮৭টি) | ঢাকা (২৫৬টি) | রংপুর (২৪৪টি) |

(সূত্র: তথ্য কমিশন, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮। বন্ধনীতে আবেদনের সংখ্যা)

### *৩.৮ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ*

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৭(১) উপ-ধারা অনুসারে তথ্য কমিশন নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের শুনানি শেষে দোষী সাব্যস্ত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের গুরুত্ব অনযায়ী প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে অনধিক ৫,০০০ টাকা জরিমানা করে থাকে। এ ছাড়া ২৭(৩) উপ-ধারা মোতাবেক উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করতে পারে। ২০১১-২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৫৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ২০১১-১৫ মেয়াদে ০৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি দেয়া হয়। ২০১৬ সালে ০৬টি, ২০১৭ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালে ১০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় (তথ্য কমিশন, ২০১৮)।

## ৪. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ

জনগণ তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করে। তাই এ আইনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ভিন্ন মাত্রার হবে। বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক পর্যায় থেকে আইনটি নিয়ে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করা হয়। রিইব, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, টিআইবি এর মতো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গবেষণার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। এর পাশাপাশি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, ড. ইফতেখারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, জনাব মরতুজা আহমদ, অধ্যাপক আফসান চৌধুরী প্রমূখের লেখায়, সাক্ষাৎকারে বা আলোচনায় চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গ উঠে আসে। এ ছাড়া তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনেও আইনটি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জের উল্লেখ থাকে। আলোচ্য নিবন্ধে উক্ত সকল চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে আইনটির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

### *৪.১ আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা*

#### *৪.১.১ আইন সম্পর্কে জনগণের যথাযথ জ্ঞানের অভাব*

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এ আইন সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয়। যেহেতু আইনটি জনগণ প্রয়োগ করবে তাই তাদের জানা খুবই জরুরি। এ ছাড়া জনগণের রয়েছে তথ্য সাক্ষরতার ঘাটতি। অর্থাৎ কোন দপ্তরে গেলে কোন তথ্য পাওয়া যাবে বা কীভাবে তথ্য কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। তাই প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়ার আবেদনের সংখ্যা খুবই কম। টিআইবি এর একটি গবেষণায় অধ্যাপক আফসান চৌধুরী বলেন, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে

৭৫% ভাগ মানুষের কোনো ধারণা নেই। ২৫% ভাগ এ আইনটির কথা শুনলেও এর মধ্যে ২০% ভাগ মানুষ এ আইনটি কী তা জানেন না। মূলত মাত্র ৫% ভাগ মানুষের তথ্য অধিকার আইনের ধারণা রয়েছে (জাগোনিউজ২৪.কম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। কুমিল্লার একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্যদের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৬% ভাগ উত্তরদাতা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না (রহমান: ২০১০)। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৩২% ভাগ জনগণ তথ্য আইন সম্পর্কে বোঝে না বললেই (very low) চলে। আর ৩২% ভাগ উত্তরদাতা কম (low) মাত্রায় বোঝে। মাত্র ৪% ভাগ উত্তরদাতা ভালোভাবে (high) বোঝে। অর্থাৎ ৬৪% ভাগই ঠিক মতো আইনটি বোঝে না (Hasan, 2014)। এমতাবস্থায় জনগণ আইনটি প্রয়োগ করে সুফল পেতে বঞ্চিত হচ্ছে।

### *৪.১.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আইন সম্পর্কে অস্পষ্টতা*

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনেকের এ আইন সম্পর্কে সম্মক ধারণার ঘাটতি রয়েছে। অনেকে আবার হাতে-কলমে যথাযথ প্রশিক্ষণ পায়নি। এ আইনটি সঠিকভাবে রপ্ত করতে হলে কোয়ালিটি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অনেক প্রশিক্ষণে শুধুমাত্র ১/২ ঘন্টার সেশনে পুরো আইন রপ্ত করা সম্ভব নয়। এর অনেক খুঁটিনাঁটি বিষয় রয়েছে যা প্রয়োগের সময় জানা আবশ্যক। এ অস্পষ্টতার জন্য অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে অনীহা বা নেতিবাচক মানসিকতা কাজ করে। অনেক কর্তৃপক্ষ আবার কর্মকর্তাদের অনেকটা দায়সারাভাবে দায়িত্ব প্রদান করে রেখেছে। এহেন অবস্থায় অনেক দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, বিকল্প কর্মকর্তার নাম ও পদবি সহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেনি। আবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনেকের চাকুরি বদলিযোগ্য। এতে নতুনভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শিখতেও অনেক সময় লাগে। এমতাবস্থায় আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

### *৪.২ গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও মানসিকতা*

এদেশের দপ্তরগুলোর বেশিরভাগই বেড়ে উঠেছে বৃটিশ-পাকিস্তান কলোনিয়াল ধাঁচে। যেখানে জনগণের কাছ থেকে দূরে থেকে সরকারি কর্মচারীগণ তথ্য গোপন করার সংস্কৃতির চর্চা করেছে। এটি দীর্ঘদিনের অনুশীলন হওয়ার ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা রয়েই গেছে। এরা বৃটিশ আমলে প্রণীত কিছু দাপ্তরিক আইন-বিধির জালে নিজেদের আড়ালে রেখেছে। উদারহণস্বরূপ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯২৩ এর ৫(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপন বিষয় (তথ্য) থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে, (খ) তথ্য ব্যবহার করে, (গ) তথ্য বিক্রি করে, (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয় – তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। প্রায় ১৪৮ বছরের পুরনো এভিডেন্স এ্যাক্টের ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ উপ-ধারা মতে কোন সরকারি অঙ্গসংগঠনের বিভাগীয়

প্রধানই শুধুমাত্র তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন। এ ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা ৯৯ অনুযায়ী তথ্য দেয়া যাবে না। রুলস অব বিজনেস (১৯৯৬) সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশে সরকারি কর্মকর্তাগণের উপর সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এর সাথে পরিপূরক হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের শপথনামাও রয়েছে (হালিম, ২০১০)। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর (১৯) ধারায় দলিল-পত্রাদি সংবাদ মাধ্যম বা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এসব আইনে দীক্ষিত ও পরিচালিত। যদিও তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তথাপি দীর্ঘদিনের চর্চায় যে মানসিকতা গড়ে উঠেছে তা এখনো সুস্পষ্ট। ফলে জনগণের সাথে এ কর্তৃপক্ষ শ্রেণির বিস্তর ফারাক এখনো বিদ্যমান রয়েছে। জনগণের সাথে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করে এরা নিজেদেরকে ঝামেলামুক্ত রাখার মানসিকতায় অভ্যস্ত। অথচ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যে বেতন-ভাতার সংস্থান হয় তা এ শ্রেণি ভুলে যায়। এর শেকড় উপড়ানো এত সহজ নয়। তাই যেকোনো অফিসে গেলে কর্মকর্তা-কর্মচারী এ গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করবেন তা অনেকক্ষেত্রে কঠিন হয়ে উঠছে।

### *৪.৩ কর্তৃপক্ষের অনীহা, অসচেতনতা ও অসহযোগিতা*

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা থাকা আবশ্যক। কিন্তু আইন পাশের প্রায় এক যুগ পরেও কর্তৃপক্ষের অনীহা, অসচেতনতা ও অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়ে জনগণকে খুঁজে নিতে হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে বা আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কে বা কোথায় আবেদন করতে হবে। অথচ এটি দপ্তরে সবার সহজে নজরে আসে এমন জায়গায় প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা বিধি-বিধানে রয়েছে। আবার অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাপ্তরিক বিধির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে আবেদনকারীর আগ্রহের উপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অবাধ তথ্য প্রবাহ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং জনগণ আস্থা হারাচ্ছে। বিষয়টি তথ্য কমিশনের শুনানিকালে গোচরীভূত হচ্ছে। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এর মতে, কমিশনের শুনানিতে উপস্থাপিত তথ্য ও দলিলপত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর তথ্যটি তাঁর কাছে মজুদ থাকা এবং তথ্যটি দেয়ার বাধ্যবাধকতা অনুধাবন করে সরবরাহ করতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের অনীহা বা অসহযোগিতার কারণে আইন প্রয়োগ করতে পারা যাচ্ছে না। এ জন্য আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তা এখনো নিয়োগ হয়নি (আহমদ: ২০১৮)।

### ৪.৪ তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যা

তথ্য অধিকার আইনের ৫ ধারায় তথ্য সংরক্ষণ ও ৬ ধারায় তথ্য প্রকাশ ও প্রচার তথা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া ২২ আগস্ট ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ জারি করে (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০৩ নভেম্বর ২০১০)। বর্ণিত ধারা ও প্রবিধানমালায় তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বলা রয়েছে। কিন্তু এদেশের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পুরনো এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। যথাযথ ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং পদ্ধতির অনুসরণ সঠিক মাত্রায় করা হচ্ছে না। অনেক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস, সংরক্ষণ, বাছাই বা বিনষ্টকরণ, ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে ঠিকমতো বুঝতে পাচ্ছে না। বার্ষিক প্রতিবেদনও সঠিকভাবে প্রণীত হচ্ছে না। এতে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেমনটা প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ উল্লেখ করেন, তথ্য সহজলভ্যকরণ, সংরক্ষণ ও শ্রেণিবিন্যাস, ব্যবস্থাপনা; প্রকাশ ও প্রচার এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সুনির্দিষ্ট বিধান ও তা পালনে বাধ্যবাধকতা আইনে থাকা এবং উপর্যুপরি পত্র যোগাযোগ সত্ত্বেও তা অনুসরণ কর্তৃপক্ষ করছেন না (আহমদ: ২০১৮)। সরকার ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু করলেও তার গতি আশানুরূপ নয়। ইংল্যান্ডের মতো দেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর আরো কয়েক বছর লেগেছিল তথের সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে (ফেরদৌস, ২০১১)।

### ৪.৫ আইনের পরিধির ক্ষেত্রে ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সীমাবদ্ধতা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কর্তৃপক্ষের পরিধির ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যাচ্ছে। জনগণের অর্থ যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রহণ, ব্যয় করে আবার সরকারি স্বীকৃতি রয়েছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এ আইনের আওতায় আসেনি। যেমন- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান (রহমান, ২০১৭)। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অসংখ্য। এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে জনগণের মনে ব্যাপক ক্ষোভ ও জানার আগ্রহ রয়েছে। এদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সব ধরনের তথ্য জানা খুবই জরুরি। আবার যদি কোন কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয় তবে তার বিরুদ্ধে কমিশন আইনগতভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তবে এ সংক্রান্ত অভিযোগ এলে কমিশন দ্রুত নোটিশ করতে পারে। এটিও ভুক্তভোগী জনগণকেই করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

## ৫. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও অসাধারণ আইন। এ আইনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে জনসাধারণের ক্ষমতায়নে এ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নিরসন করে আইনটি কার্যকর করা গেলে দেশের সরকারি-বেসরকারি নানা দপ্তর ও সংস্থার কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, দুর্নীতি হ্রাস এবং সর্বপরি সুশাসন নিশ্চিত করা অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়সমূহ নিম্নরূপ-

### ৫.১ জনসাধারণকে আইন ব্যবহারে সক্রিয়করণ

তৃণমূল পর্যায়ের সকল মানুষ যেন আইনটি ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সহজভাবে আইনটি তুলে ধরতে হবে। আইনটি সম্পর্কে ব্যাপকমাত্রায় তৃণমূল মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে যেন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে তারা সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের মনে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর সম্পর্কে যেন নেতিবাচক কোনো ধারণা না থাকে বরং উৎসাহী হয়ে তথ্য গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয় তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি।

### ৫.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপিল কর্মকর্তাদের কোয়ালিটি প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতে হলে আইনটি সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষের গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু তা শুধুমাত্র অবহিতকরণ কর্মসূচির মতো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত হবে না। এ জন্য প্রয়োজন কোয়ালিটি প্রশিক্ষণ। শুধুমাত্র তথ্য অধিকারের উপর একক মডিউল প্রণয়ন করে তার উপর কোয়ালিটি প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দিলে আইন প্রয়োগে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতি বা ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে মুক্ত মনে তথ্য প্রদানে উদ্যোগী করে তুলবে।

### ৫.৩ আধুনিক ও ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা হতে হবে আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে। যথার্থ ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা যায়। জনগণের অর্থে প্রণীত যাবতীয় প্রকাশনা এবং সংগৃহীত অন্যান্য তথ্যাদি ওয়েবসাইটে বা নেটওয়ার্কে প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সার্পোটের যোগান দেয়া প্রয়োজন।

### *৫.৪ আইনের পরিধি বাড়ানো*

আইনে কর্তৃপক্ষের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ দেশের অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে যারা এ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে বহু প্রশ্ন রয়েছে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি।

### *৫.৫ সৃজনশীল প্রচার*

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যেহেতু তৃণমূল মানুষের ধারণা একেবারেই নেই তাই এ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সৃজনশীল ও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ডকুমেন্টারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি করে নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে প্রচার চালাতে হবে যে তৃণমূল মানুষের তথ্য সাক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারে যে কোন তথ্য, কীভাবে, কোথায় পাওয়া যাবে এবং তা কীভাবে কাজে লাগাতে হবে।

### *৫.৬ কমিশনে শুনানির ক্ষেত্রে টিসিভি (time, cost, visit) হ্রাসের ব্যবস্থা*

বিদ্যমান ব্যবস্থায় একজন অভিযোগকারীকে ঢাকায় এসে শুনানিতে অংশ নেয়ায় সময় লাগে ও খরচ হয় এবং আসা-যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশনকে টিসিভি হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে শুনানির ব্যবস্থাকরণ বা উপজেলা নির্বাহী অফিস অথবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে (ইউডিসি) সম্পৃক্ত করে ভিডিও কনফারেন্সিং (কমিশন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শুরু করেছে মাত্র) এর মাধ্যমে ব্যাপকমাত্রায় শুনানির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

### *৫.৭ কমিশনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ*

কমিশনকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য প্রয়োজনে আইনের সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ কমিশনের আদেশ/ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে 'Contempt Proceeding draw' করার ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। কমিশনের আদেশ না মানার ফলে ২০১৮ সালে ২৬টি এবং আদেশের আংশিক তথ্য প্রদানের ফলে ২০টি অভিযোগ দ্বিতীয়বারের মতো শুনানি করতে হয়েছে। এ ছাড়া কমিশনে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান সংবাদিক, গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগ, সাংবাদিকতা, তথ্য বিজ্ঞান বা আইন বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা যেতে পারে।

### ৫.৮ সম্পর্কিত ও সাংঘর্ষিক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন

যদিও অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তথাপি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঐ সব আইন-বিধি বাধা সৃষ্টি করছে বা অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সাথে সম্পর্কিত ও সাংঘর্ষিক ঐ সব আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তৃণমূলে বাস্তবায়ন মসৃণ করা যায়।

### ৫.৯ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা বা স্পিরিট সর্বোচ্চ প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। আর এটি করা যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে – জনগণকে আসতে হবে না বরং জনগণের কাছে কর্তৃপক্ষ যাবে। কিন্তু এটি আইনের বিধান থাকলেও তেমন কার্যকর হচ্ছে না। এটি কার্যকরের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৫.১০ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সাথে সমাজের সকল স্তরের অংশীজন জড়িত রয়েছে। তাই সকল অংশীজনের সমন্বয়ে স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ পরিকল্পনায় শিশু, নারী এবং প্রান্তিক মানুষের তথ্য অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হতে হবে।

### ৫.১১ গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিওদের বর্ধিত ভূমিকা

তথ্য কমিশনের একার পক্ষে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্ভব নয়। এ জন্য তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এনজিও, অ্যাকাডেমিশিয়ান ও আইনজ্ঞের বর্ধিত ভূমিকা রাখা খুবই জরুরি। এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে হবে। তৃণমূলে এ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ করে এনজিও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

### ৫.১২ তথ্য পাওয়ার সময় কমানো

বিদ্যমান আইনে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল তথ্য প্রদানের সর্বোচ্চ ২০ বা ক্ষেত্র মতে ৩০ কার্য দিবস নির্ধারণ করা রয়েছে যা বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি সময় বলে প্রতীয়মান। তাই এ সময় কমানো যেতে পারে।

### ৬. উপসংহার

১৭৭৬ সালে সুইডেনে প্রণীত প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের প্রায় ২৩৩ বছর পর এদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয় যার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে আইন কমিশনের সুপারিশের মধ্য দিয়ে। তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের উপর জনগণ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। জনগণের ক্ষমতায়নে তাই আইনটি চমৎকার। এ আইনের মধ্য দিয়ে সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সকল ধরনের তথ্য পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের ক্ষেত্রে। গণমাধ্যমগুলো সামনে সুযোগ এসেছে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সুশাসন নিশ্চিতকরণে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার। তবে আইনটি প্রণয়নের প্রায় এক যুগের এসে এর কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে যেতে পারেনি। বিপুল জনগোষ্ঠীর তুলনায় তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কমিশনে যে সব তথ্য না পেয়ে অভিযোগ করা হয়েছে তা অনেকটা সাধারণ তথ্য। বিপুল জনগোষ্ঠী আইনটি সম্পর্কে অবগত নয়। এনজিও থেকে তথ্যের আবেদনও অনেক কম। কয়েকটি জেলায় কোন কোন বছর তথ্য চেয়ে কোন আবেদনই পড়েনি। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেই সবচেয়ে বেশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জমা পড়েছে বিগত কয়েক বছরে। এই তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি যার পেছনে কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসবের মধ্যে আইন সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপিল কর্তৃপক্ষের আইনটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণার অভাব, নেতিবাচক মানসিকতা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি ধারণ, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি ইত্যাদি অন্যতম। এ সব চ্যালেঞ্জ নিরসনে যে সব করণীয় আলোচ্য নিবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা মানা হলে তথ্য অধিকার আইন এর মৌল উদ্দীপনা বা স্পিরিট বাস্তবায়িত হবে। তবে এর সাথে যে বিষয়টি খুবই জরুরি তা হলো নীতি-নির্ধারকদের সদিচ্ছা। এসবের ব্যবস্থা করা হলে আইনটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং জনগণ কাঙ্খিত সুফল পাবে।

## তথ্য-নির্দেশ

আহমদ, মরতুজা (২০১৮)। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর একটি বিশ্লেষণ'। অন্তর্গত, কালের কণ্ঠ। ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

আহমদ, মরতুজা (২০১৯)। 'তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন'। অন্তর্গত, তথ্য কমিশন নিউজ লেটার, জুন সংখ্যা। ঢাকা: তথ্য কমিশন।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*। লিঙ্ক- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.

html, ০১ জুন ২০২০ এ প্রবেশ।

জাগোনিউজ২৪.কম, ঢাকা: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, লিঙ্ক: https://www.jagonews24.com/education/news/529313, ৩১ মে ২০২০ এ প্রবেশ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। লিঙ্ক- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1011.html, ০৫ জুন ২০২০ এ প্রবেশ।

তথ্য কমিশন, (২০০৯)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯। ঢাকা।

(২০১০)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০। ঢাকা।

(২০১৬)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬। ঢাকা।

(২০১৭)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭। ঢাকা।

(২০১৮)। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮। ঢাকা।

দাশ, ভবেশ এবং রোবায়েত ফেরদৌস (২০০৭), সম্পাদিত। তথ্যের অধিকার। ঢাকা: চারদিক।

ফেরদৌস, রোবায়েত (২০১১)। 'তথ্য অধিকার আইন: বাস্তবায়ন চালচিত্র ও চ্যালেঞ্জ-দুই'। অন্তর্গত, বাংলানিউজ২৪.কম। ঢাকা, ০৬ অক্টোবর ২০১১।

ফেরদৌস, রোবায়েত এবং অলিউর রহমান (২০০৮)। তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে। ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)।

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০৩ নভেম্বর ২০১০।

রহমান, অধ্যাপক ড. গোলাম (২০১৭)। 'তথ্য অধিকার আইনের পরিধি বাড়াতে হবে'। অন্তর্গতা, দৈনিক সমকাল। ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

রহমান, কাজী সোনিয়া (২০১০)। "গ্রামীণ মানুষের তথ্য চাহিদা: রাইচোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপর একটি সমীক্ষা", অন্তর্গত, পল্লী উন্নয়ন জার্নাল। কুমিল্লা: বার্ড, সংখ্যা ১৩।

রফিকুজ্জামান, মো. (২০১৬)। 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, তথ্য অধিকার আইন:

প্রাসঙ্গিক ভাবনা'। অন্তর্গত, ভোরের কাগজ। ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব), (২০১১)। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের দুই বছর: একটি পর্যালোচনা। ঢাকা: রিইব।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (২০১৭)। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ। ঢাকা: বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

হক, মুহাম্মদ লুৎফুল (২০১৩)। 'তথ্য অধিকার দিবস: আমাদের কী করতে হবে'। অন্তর্গত, প্রথম আলো। ঢাকা: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

হালিম, ড. সাদেকা (২০১০)। 'তথ্য অধিকার আইন: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ'। অন্তর্গত, একুশ নিউজ মিডিয়া। লস এঞ্জেলেস, লিঙ্ক: https://ekush.wordpress.com/, ০৩ জুন ২০২০ তে প্রবেশ।

Hasan, Ziaul (2014). 'Compliance of the provisions of RTI Act, 2009 by NGOs in Bangladesh: A Case-Study of BRAC', an Unpublished MA Thesis, submitted to Institute of Governance Studies, BRAC University, Dhaka.

www.ngoab.gov.bd, ০১ জুন ২০২০ এ প্রবেশ।

# নারী জনপ্রতিনিধিদের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ একটি সমীক্ষা।

মোঃ রুহুল আমীন*

**সারসংক্ষেপঃ**

নারী হিসেবে শতাব্দির পর শতাব্দি অবহেলা, অবজ্ঞা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন নারীরা। নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের মতো রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও থাকার কারণে নারী জনপ্রতিনিধিরা নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন (USAID: 2016, June)। অতীতে ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত অবমূল্যায়ণ করা হতো। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় হাজিরা, ভিজিডি, ভিজিএফ তালিকা তৈরির মধ্যেই আটকে ছিল নারী সদস্যদের ক্ষমতায়ণ। সরকারী বরাদ্দ থেকে শুরু করে এলাকার উন্নয়নে পরিষদের গৃহীত কোন প্রকল্পেই নারী সদস্যদের প্রকল্পের প্রধান করা হয়না সচরাচর। কোন না কোন পুরুষ সদস্যের শরণাপন্ন হতে হতে হয় তাঁদের। নানা ঝামেলা ও পুরুষ সদস্যদের মারপ্যাঁচে ঠিকমতো প্রকল্প বাস্তবায়নও করতে পারেন না নারী সদস্যরা। আবার অনেক সময় সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের রোষানলে পড়েও কোণঠাসা হতে হয় তাদের। ১৯৭২-এ প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান নারীকে সর্বক্ষেত্রে সমতার দৃষ্টিতে দেখবার কথা বললেও সমাজ কখনোই জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবার জন্য নারীকে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে যুক্ত হবার ব্যাপারে উৎসাহ কিংবা সুযোগ দেয়নি (Khan, A. S: 2013, p.143)। তৃণমূল স্তরে নারীরা এলে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হয়, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে গণতন্ত্র ভিত্তি পায়। তবে, সচেতনতা ও অধিকার সম্পর্কে অগ্রসর হয়েছে এক সময়ের অবহেলিত ইউনিয়ন পরিষদের নারী জনপ্রতিনিধিরা। দেশের জনগণ এখন তাঁদের সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করছেন। সংসারের দায়িত্ব পালন করেও স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন নারী জনপ্রতিনিধিরা। পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর কারণেও নারীদের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যাক্তিক ও সামাজিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নারী সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী ভুমিকা পালন করতে পারছেন না। তাই সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আলোচ্য গবেষণা কার্যটি কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের উপর পরিচালিত হয়েছে।

* *সহকারী অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।*

## ১. ভূমিকাঃ

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যানকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর”। আমাদের চেয়ে বেশ কয়েক প্রজন্ম আগের কবি কাজী নজরুল ইসলামও নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এখনো বহুলাংশেই নারীর প্রতিকূলে (Hossain, N and Akhter, S: 2011, pp.25-27)। জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের প্রতিনিধিত্বের আওতা বাড়ানো (Mirya, M. H & Mannan, S: 2016, p.55)। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারে সমাজের বিভিন্ন অংশের, বিশেষত নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থা। এর জন্য অনেক দিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন নারীরা। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁদের। পর্যায়ক্রমে তাঁদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে তাঁদের জনপ্রতিনিধিত্বের পরিধি বেড়েছে। কিন্তু কাগজপত্রে যতটা অগ্রগতি হয়েছে, বাস্তবে ততটা হয়নি। সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিরা জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে নানা সমস্যার মধ্যে এখনও ঘুরপাক খাচ্ছেন। কর্ম এলাকা নির্ধারণ, দায়িত্ব বণ্টন, বরাদ্দ প্রভৃতি বিষয় এখনো সুনির্দিষ্ট নয়।

১৯৯৭ সালে জাতীয় সংসদের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যাত্রা শুরু হয় সংরক্ষিত নারী আসনের। নারীর ক্ষমতায়নে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ, পরে পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা ও জেলা পরিষদে এ ব্যবস্থা চালু হয়। সব মিলিয়ে বর্তমানে দেশের চার হাজার ৫৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৩২৯টি পৌরসভা, ১১টি সিটি করপোরেশন, ৪৮৯টি উপজেলা, ৬১টি জেলা পরিষদে (পার্বত্য তিন জেলা বাদে) প্রায় ১৮ হাজার নারী জনপ্রতিনিধি দায়িত্ব পালন করছেন। সংসদেও রয়েছেন সংরক্ষিত আসনে ৫০ জন নারী প্রতিনিধি (Islam, S, M & et al: 2014, pp.41-43)। তবে, ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যার ঘাটতি; সময়মতো সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে না পারা; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচনের মধ্যে কালক্রমিক সমন্বয়ের অভাব, আইনগত জটিলতা, নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপকীয় সামর্থ্যের ঘাটতি, নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি কারণে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিরা শুধুই শোভা হয়ে থাকছেন। নারী সদস্যদের ঠিকমতো ভাতাও দেওয়া হয় না (দৈনিক কালেরকণ্ঠ: ২০১৮)।

ইউনিয়ন পরিষদ আইনে বছরে দুবার ‘ওয়ার্ড সভা’ করার বিধান রয়েছে। এই সভায় ভোটাররা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই সভা নিয়মিত

হচ্ছে না। একারনে পুরুষের পাশাপাশি নারী জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিও নিশ্চিত হচ্ছে না। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম থাকে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে স্থানীয় সরকারকে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও সামাজিক নানা ধরনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কিছু অবকাঠামো নির্মাণ, রাজস্ব সংগ্রহ, প্রত্যয়নপত্র প্রদান, কিছু বিচার-সালিস করার মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। নারী জনপ্রতিনিধিদের সমান সুযোগ, দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করার কথা বলা হলেও তা কার্যত: দেখা যায় না (দৈনিক প্রথম আলো: ২০১৯, ১৮ মার্চ)।

আলোচ্য গবেষণা কার্যটি কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের উপর পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা কার্যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

## ২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

গবেষণা কর্মের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রনয়ন করা। এছাড়া, গবেষণা কার্যের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ-

- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের সম্পর্কে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ;
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের কার্যক্ষেত্রে সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান; এবং;
- সমস্যা সমাধানকল্পে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন।

## ৩. গবেষণা পদ্ধতিঃ

পরিচালিত গবেষণাটি মূলত তথ্য উদ্‌ঘাটনমূলক একটি কার্য। একারনে গবেষণা কার্য সম্পাদনে সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) পদ্ধতি

ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কার্যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৭৫ (পচাত্তর) জন নারী সদস্যকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির সাহায্যে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা কার্যের প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে প্রাথমিক উৎসের সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন পুস্তক, জার্নাল, পত্রিকা প্রভৃতির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

## ৪. গবেষণার যৌক্তিকতাঃ

বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রতিকূলতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে এ কথা ঠিক যে, আমাদের মতো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের মতো নারীরা যদি নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেত তবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অনেকাংশেই সম্ভব হতো। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিরা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার কারনে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাত্বিকভাবে, নারী জনপ্রতিনিধিদের সাংবিধানিক অনেক সুযোগ-সুবিধা'র কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা অন্যান্য পর্যায়ের নারী জনপ্রতিনিধিদের তুলনায় কাজের পরিবেশ, বেতন-ভাতা এবং আনুসাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা যা পেয়ে থাকেন তা খুবই সামান্য বা সীমিত। মূলতঃ এ সকল সমস্যার প্রকৃতি জানা ও তার সমাধান এবং এ জাতীয় কার্যক্রমে নারীদের আরও অধিক হারে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের নেতিবাচক মনোভাব দূর করার উদ্দেশ্যেই গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হয়েছে।

## ৫. গবেষণা এলাকাঃ

বর্তমান কুমিল্লা চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন একটি জেলা। প্রাচীনকালে এটি সমতট জনপদের অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তীতে এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হয়েছিল। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনাদি থেকে যতদূর জানা যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রিপুরা গুপ্ত সম্রাটদের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৌদ্ধ দেববংশ রাজত্ব করে। নবম শতাব্দীতে কুমিল্লা হরিকেলের রাজাগণের শাসনাধীনে আসে। প্রত্ন প্রমাণ হতে পাওয়া যায় যে, দশম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর এ অঞ্চল চন্দ্র রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছে (www.comilla.gov.bd)। ১৭৯০ সালে ত্রিপুরা জেলা নামে এই জেলা গঠিত হয় (banglapedia.org)। ১৯৪৭ সালে

দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা জেলার নামকরণ করা হয় কুমিল্লা। কুমিল্লা জেলায় সতেরটি উপজেলা রয়েছে। গবেষণাকর্মের এলাকা নিম্নবর্তিঃ

| ক্রমঃ | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা | মোট তথ্য প্রদানকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কুমিল্লা | মেঘনা | চন্দনপুর, বড়কান্দা, গোবিন্দপুর, লুটেরচর, রাধানগর। | ৫*৫=২৫ জন | ২৫ জন |
| ২। | | চান্দিনা | মাধাইয়া, জোয়াগ, গল্লাই, সুহিলপুর, মাইজখার। | ৫*৫=২৫ জন | ২৫ জন |
| ৩। | | তিতাস | সাতানি, জগতপুর, বলরামপুর, কলাকান্দি, মজিদপুর। | ৫*৫=২৫ জন | ২৫ জন |
| | | | | **মোট=** | **৭৫ জন** |

## ৬. ইউনিয়ন পরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস

১৮৬৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর লর্ডমেয়ো স্থানীয় এলাকার উন্নতির জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। তারপর ১৮৮২ সালে রর্ড রিপন প্রথম এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। লর্ড রিপনের এ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলায় বিধান সভায় বিল উত্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় জনসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রথম ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের নাম ছিল ইউনিয়ন কমিটি। আজকে আমরা যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বা ইউনিয়ন পরিষদের সুফল ভোগ করছি, তা ১৩০ বছর পূর্বে লর্ড রিপনই প্রথমে সুপারিশ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

১৮৮৫ সালের আইনে তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রাম স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্তরগুলো হল (১) জেলা কমিটি (২) থানা কমিটি ও (৩) ইউনিয়ন কমিটি (Aminuzzaman, S.M: 2013, p.115)। তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ৯ জন। তারা ইউনিয়নের অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। প্রথম অবস্থায় ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান পদ ১৮৮৫ সালের বিধানে ছিল না। ১৯০৮ সালে পশ্চিম বাংলায় ১৮৮৫ সালের আইনের সংশোধন কালে চেয়ারম্যান পদের সৃষ্টি করা

হয় (Jahan, R: 1976. Pp.227-250)। সে অনুসারে ১৯১৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রচলিত হয়। তখন সদস্যগণের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রথা ছিল। ইউনিয়ন কমিটির কার্যকাল ছিল মাত্র ২ বছর। কিন্তু ১৯১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল স্যার সুরেন্দ্র প্রাসানা সিন্হা ১৮৭০ সালের গ্রাম পঞ্চায়েতী আইন এবং ১৮৮৫ সালের ইউনিয়ন কমিটি ভেঙ্গে একটি নতুন কমিটি গঠন করার সুপারিশ পেশ করেন। নতুন এই কমিটির নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন বোর্ড। উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল ছিল ৩ বছর (Latha A, P: 2010, pp. 1139-1148)। ১৯৩৫ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল ৪ বছর করা হয়। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন নং ৩৫ গৃহীত হলে ১৯১৯ সালের আইন সংশোধন করা হয়। ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। এই আইনে সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয় (Blair, H: 2000 pp.21-39)।

১৯৫৯ সালের ২৭শে অক্টোবর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে। ইউনিয়ন বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন ইউনিয়ন কাউন্সিল। উক্ত ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বছর। ভাইস চেয়ারম্যান পদ ১৯৬৫ সালে বাতিল করা হয়। ১৯৭১ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় ত্রাণ কমিটি। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারি ইউনিয়ন কাউন্সিল ও ত্রাণ কমিটি ভেঙ্গে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নামকরণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিধি প্রণীত হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় ইউনিয়ন পরিষদ। জিয়ার সামরিক শাসনামলে ১৯৭৬ সালের ২০শে নভেম্বর স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নাম ঠিক রেখেই সব সরকার কাজ চালিয়ে যান। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ৩টি ওয়ার্ডের পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ড সৃষ্টি করেন এবং ৩ জন মহিলা সদস্যকে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও এই পরিষদকে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পথ এখনও বহু দূরে (www. sylhet.gov.bd)।

## ৭. ইউনিয়ন পরিষদে নারী জনপ্রতিনিধির চিত্র

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশে বতর্মানে ৪৮৬ উপজেলায় ৫ হাজার ৪০২টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। স্থানীয় সরকারের সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। দেশের সিংহভাগ লোকের বসবাস ইউনিয়নে। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখা হয়েছে (Akhter, S: 2002, p.131)। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ১০ (১) ধারায় বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে যাদের নয়জন

সাধারণ এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনের সদস্য হবেন। এ আইনের একই ধারার উপধারা ৩-এ বলা হয়েছে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধু মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকবে, যা সংরক্ষিত আসন এবং ওই আসনের সদস্যরাও এ আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। একজন মহিলা ইউপি সদস্য তিনটি ওয়ার্ডের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তবে এ ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সচেতনতা ও অধিকার চর্চার ঘাটতি অনেকাংশে দায়ী (Panday, P.K: 2016, Pp.573–598)। দেখা গেছে, বেশির ভাগ মহিলা সদস্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের কেবল অক্ষর জ্ঞান রয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। পরিষদের ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্পর্কে মহিলা ইউপি সদস্যরা সঠিকভাবে জানেন না। নিজ উদ্যোগে অনেক মহিলা ইউপি সদস্য যৌতুক, বাল্যবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ ও মাদকাসক্তের মতো সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে কাজ করছেন (দৈনিক যায় যায় দিন: ২০১৮, ২২ অক্টোবর)।

## ৭. গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণঃ

গবেষণা কার্যে ৭৫ জন নারী জনপ্রতিনিধিকে নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছে। পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রে নারী জনপ্রতিনিধিদের নানবিধ সমস্যা ও তা সমাধান কল্পে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে বিষয়টি আলোচনা করা হলঃ

### *৭.১ বয়সঃ*

**টেবিল-১ঃ কর্মজীবী নারীদের বয়স।**

| ঊয়স | গনসংখ্যা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|
| ৩০-৪০ | ৫ | ৭% |
| ৪০-৫০ | ২৫ | ৩৩% |
| ৫০-৬০ | ৪৫ | ৬০% |
| | **N=৭৫** | **১০০%** |

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নমুনায় অন্তর্ভুক্ত নারী জনপ্রতিনিধিদের গড় বয়স ছিল ৪৫ বৎসর। অধিকাংশ নারী জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা হল ৬০% যাদের বয়সের সীমা ৫০-৬০ এর মধ্যে অবস্থিত। ৩০-৪০ বছর সীমায় নারী জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ৭% । অন্যদিকে, ৪০-৫০ বয়সসীমার মধ্যে নারী জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ৩৩%।

## ৫.২ শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

**সারণি-১ঃ নারী জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।**

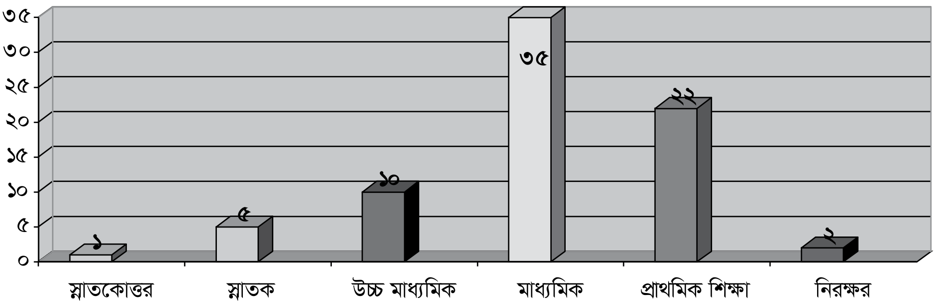


উপরোক্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, নমুনায় অন্তর্ভুক্ত নারী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ১% নারী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন। অন্যদিকে, স্নাতক/সম্মান ডিগ্রীপ্রাপ্ত নারী জনপ্রতিনিধির সংখ্যা ৫%। ১০% নারী জনপ্রতিনিধি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্নকারি নারী জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ৩৫%। ২২% নারী জনপ্রতিনিধি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। অন্যদিকে, ২% নারী জনপ্রতিনিধি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

## ৫.৩ স্থানীয় পর্যায়ে যাতায়াতের মাধ্যম সমূহঃ

**সারণি-২ঃ নারী জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় পর্যায়ে যাতায়াতের মাধ্যম।**

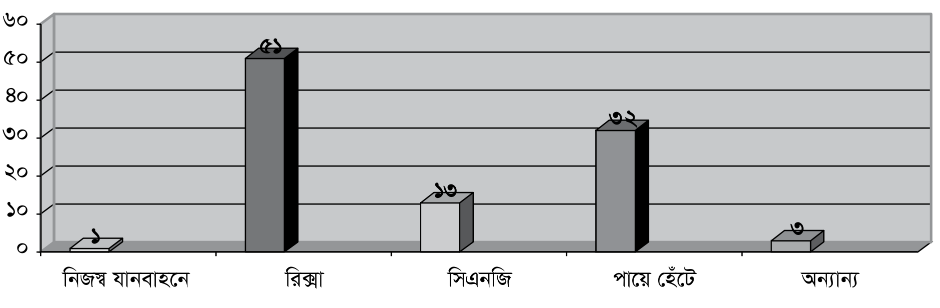


নারী জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশ নারী জনপ্রতিনিধিরা (৫১%) রিক্সাকে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ি হতে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব সর্বোচ্চ ০১-০৩ কিমি পর্যন্ত। রিক্সাকে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে নারী জনপ্রতিনিধিদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মুখোমুখি হয় প্রতিনিয়ত। ৩২% নারী জনপ্রতিনিধি পায়ে হেঁটে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে থাকেন। সাধারণতঃ বসতবাড়ি হতে কর্ম এলাকার দূরত্ব ০১ কিমি'র মধ্যে তারা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে থাকেন। ১৩%

নারী জনপ্রতিনিধিরা যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে সিএনজি ব্যবহার করে থাকেন। শুধুমাত্র ১% নারী জনপ্রতিনিধি নিজস্ব যানবাহনে যাতায়াত করে থাকেন। ৩% নারী জনপ্রতিনিধি উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থার বাহিরে অন্যান্য পরিবহনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে থাকেন যেমনঃ ইজি বাইক, অটো রিক্সা, টেম্পু প্রভৃতি।

### *৫.৪ নারী জনপ্রতিনিধিদের সন্তানাদি প্রতিপালন ব্যবস্থাঃ*

**সারণি-৩ঃ নারী জনপ্রতিনিধিদের সন্তানাদি প্রতিপালনের চিত্র।**

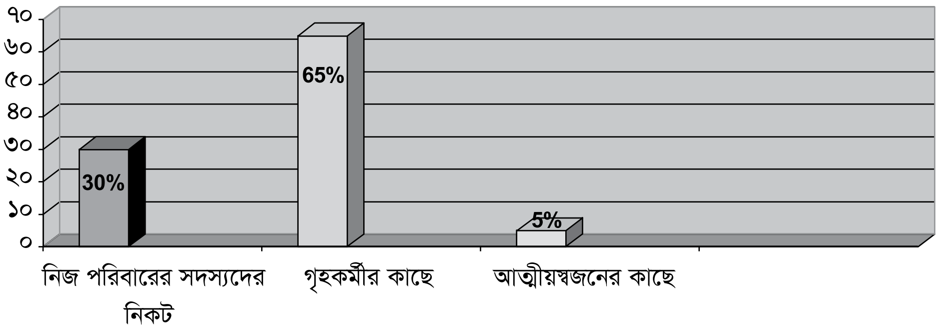


নারী জনপ্রতিনিধিদের যাদের শিশু সন্তান রয়েছে তাদের কর্মকালীন সময়ে সন্তান রক্ষনাবেক্ষণে বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ নারী জনপ্রতিনিধির (৬৫%) শিশু সন্তানকে কর্মকালীন সময়ে বাসায় গৃহকর্মীর কাছে রেখে আসেন। অন্যদিকে, ৩০% নারী জনপ্রতিনিধি কর্মকালীন সময়ে মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, ছোট বোন বা বড় সন্তানের তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন। নারী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ১% নিকট আত্মীয়স্বজন যেমনঃ খালা, ফুফু, চাচী প্রভৃতির নিকট সন্তান রেখে কর্মস্থলে কাজ করে থাকেন।

### *৫.৫ সিদ্ধান্ত গ্রহনে ভুমিকাঃ*

**টেবিল-২ঃ নারী জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের চিত্র।**

| পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন | গনসংখ্যা | শতকরা হার (%) | কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন | গনসংখ্যা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| পরিবার প্রধানের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে | ৪৫ | ৬০ | সহকর্মীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে | ৪৫ | ৬০ |
| এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন | ২০ | ২৭ | এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন | ১০ | ১৩ |

| পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন | গনসংখ্যা | শতকরা হার (%) | কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন | গনসংখ্যা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| শুধুমাত্র মতামত প্রদান করে থাকেন | ১০ | ১৩ | লিঙ্গ ভিত্তিক কারনে মতামত অবমূল্যায়ন করা | ২০ | ২৭ |
| | N=৭৫ | ১০০% | | N=৭৫ | ১০০% |

পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারী জনপ্রতিনিধিদের তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা লক্ষণীয়। ৬০% নারী জনপ্রতিনিধি পরিবারের সবার সাথে বিশেষ করে পরিবারের প্রধানের সাথে আলোচনা করে পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, ২৭% নারী জনপ্রতিনিধিরা এককভাবে নিজ পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। নারী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ১০% পরিবারিক বিষয়ে শুধুমাত্র মতামত প্রদান করে থাকেন তবে নিজ মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী জনপ্রতিনিধিদের ভুমিকা গৌণ বলেই প্রতিয়মান হয়। নারী জনপ্রতিনিধিরা (৬০%) কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিয়ে থাকেন। ১৩% নারী জনপ্রতিনিধি কর্মক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত এককভাবেই নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, ২৭% নারী জনপ্রতিনিধি মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবমূল্যায়িত হয়ে থাকেন।

### *৫.৬ কর্মস্থল সম্পর্কিত সমস্যাবলীঃ*

নারী জনপ্রতিনিধিদের কর্মস্থলের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্নের সাপেক্ষে হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন ৬০% এবং “না” উত্তর দিয়েছেন ৪০%।

**সারণি-৪ঃ কর্মস্থল সম্পর্কিত সমস্যাবলী।**

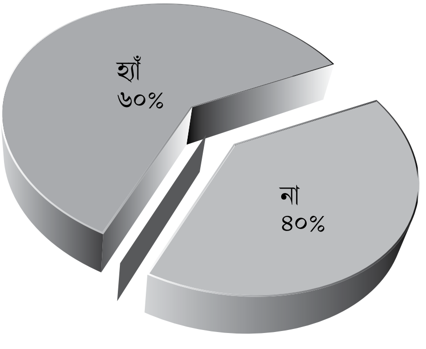


সংগৃহীত নমুনার মধ্যে হ্যাঁ উত্তর দিয়েছে ৪৫ জন। হ্যাঁ উত্তর প্রদানকারী নারী জনপ্রতিনিধিগণ

নিম্নবর্তী সমস্যার কথা উল্লেখ্য করেছেন-

**সারণি-৫ঃ কর্মস্থল সম্পর্কিত সমস্যাবলী।**

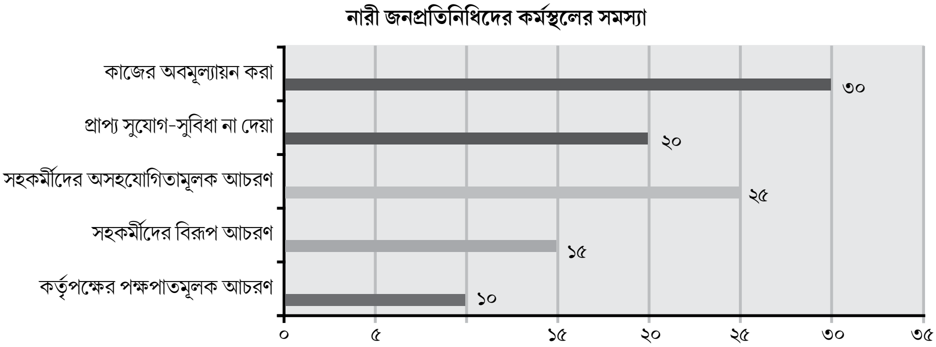


উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ১০% নারী জনপ্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তৃপক্ষের বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকেন। ১৫% নারী জনপ্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের শারীরিক ও মানসিক বিরূপ আচরণের স্বীকার হয়ে থাকেন। ২৫% নারী জনপ্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনে পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতামূলক আচরণের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ২০% নারী জনপ্রতিনিধিরা কর্মক্ষেত্রে সকলের জন্য নির্ধারিত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে পান না বা বঞ্চিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে, ৩০% নারী জনপ্রতিনিধি শুধুমাত্র লিঙ্গগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার কারণে পুরুষ কর্মীর সমান দক্ষতা সম্পন্ন হয়েও অনেক সময় অবমূল্যায়নের স্বীকার হয়ে থাকে।

### *৫.৭ দায়িত্ব পালনে অনিহার পেছনে কারণসমূহঃ*

**সারণি-৬ঃ দায়িত্ব পালনে অনিহার পেছনে কারণসমূহ।**

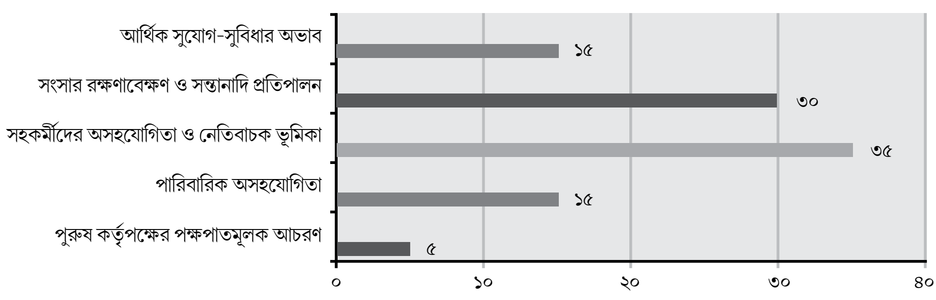

উপরোক্ত চিত্রটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৩০% নারী জনপ্রতিনিধিরা সংসার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সন্তানাদি প্রতিপালনের জন্য অনেক দায়িত্ব পালনে অপারগতা দেখিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, সহকর্মীদের অসহযোগিতা ও নেতিবাচক ভূমিকার কারনে ৩৫% নারী জনপ্রতিনিধিরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী থাকেন না। আবার, ১৫% নারী জনপ্রতিনিধিরা পারিবারিক অসহযোগিতার কারণে দায়িত্ব পালন করতে অনিচ্ছুক থাকেন। ৫% নারী জনপ্রতিনিধিরা পুরুষ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণের কারনে বিষয়টি চিন্তাভাবনা করে থাকেন। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কম হবার কারণে ১৫% নারী জনপ্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট সময়ের শেষ হবার পূর্বেই কাজ করতে অনিহা দেখিয়ে থাকেন।

### *৫.৮ সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালাঃ*

**সারণি-৭ঃ বিদ্যমান সমস্যা সমাধানসমূহ।**

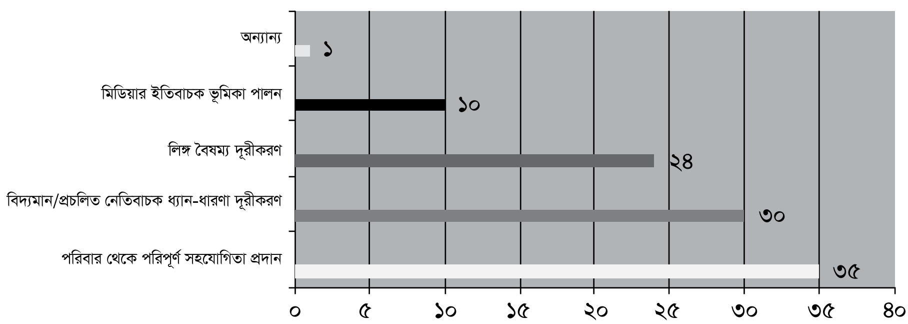


উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নারী জনপ্রতিনিধিরা পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেতিবাচক আচরণের শিকার। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ৩৫% নারী জনপ্রতিনিধি মনে করেন যে, পরিবার থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করলে কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। ৩০% নারী জনপ্রতিনিধি মনে করেন যে, সমাজে বিদ্যমান/প্রচলিত নেতিবাচক ধ্যান-ধারণাই তাদের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। ২৪% নারী জনপ্রতিনিধি মনে করেন যে, লিঙ্গ বৈষম্য দূর হলে তাদের দায়িত্ব পালন সহজতর হবে। ১০% নারী জনপ্রতিনিধি মনে করেন যে, সমাজে যেহেতু মিডিয়ার প্রভাব রয়েছে কাজেই জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তন ও জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে মিডিয়া। অন্যদিকে, ১% নারী জনপ্রতিনিধি মনে করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নারী জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

## ৬. উপসংহার ও সুপারিশঃ

নারী ক্ষমতায়নে এশিয়ার দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও স্থানীয় সরকার পরিষদের সব স্তরে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা অবহেলার শিকার হচ্ছেন। জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হলেও পরিষদে তাদের নেই সুনির্দিষ্ট কোন কাজ, নেই কোন মূল্যায়ন। আবার স্থানীয় সরকার পরিষদের আইনে নারী জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা সুস্পষ্ট নয়। ফলে দায়িত্ব পালনে প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন নারী জনপ্রতিনিধিরা। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নেই কোন সম্পৃক্ততা। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে নারীরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে (Ahmed, N. & et al: 2011, p-143)। নারী ক্ষমতায়নের নামে স্থানীয় সরকার পরিষদের সৃষ্টি করা হলেও এতে নারীদের কাজ না দিয়ে অপমানিত করা হচ্ছে। আইনেও নারীদের কাজে কোন সুযোগ রাখায় হয়নি। নারীদের ক্ষমতায়ন করতে হলে অবশ্যই নারী জনপ্রতিনিধিদের মূল্যায়ন করতে হবে। তা না হলে শুধু নির্বাচিত করে পরিষদের সদস্য বানালেই নারীর ক্ষমতায়ন হবে না (দৈনিক জনকণ্ঠ: ২০১৬, ১৬ জানুয়ারী)।

সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হলোঃ

- নারীদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নয় বরং মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা এবং কর্মক্ষেত্রে নারী হিসেবে নয় বরং সহকর্মী হিসেবে দেখা।
- দেশে বিদ্যমান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিবর্তন এবং নারী জনপ্রতিনিধি বান্ধব আইনগুলোর কার্যকর প্রয়োগ।
- সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে নারীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান মর্যাদা সহকারে উপস্থাপন করা।

## ৭. গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. সম্পাদকীয় (২০১৮, ২২ অক্টোবর), দৈনিক যায় যায় দিন । ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. শাহিন রহমান (২০১৬, ১৬ জানুয়ারী)। দৈনিক জনকণ্ঠ। ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩. সম্পাদকীয় (২০১৮, ২৪ জানুয়ারী), উপজেলা পরিষদে নারী সদস্য। দৈনিক কালের কণ্ঠ। ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪. সামছুর রহমান (২০১৯, ১৮ মার্চ): স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শাসক দলের কবজায়।

দৈনিক প্রথম আলো। ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫. Ahmed, N., Ahmed, T & Faizullah, M. (2011). Working of Upazila Parishad in Bangladesh: A Study of Twelve Upazilas, Dhaka: UNDP. p.143.

৬. Akhter, S. (2002). Status of Women Leadership in Bangladesh: Problebs and Proespects.A Study of Elected Women Members of Union Parishad. Pakintan Journal of Women's Studies: Alam-e Nishan, Vol.9 No-2. p.131.

৭. Aminuzzaman, S.M. (2013). Governance at Grassroots–Rhetoric and Reality: A Study analysis to implementation. Washington, DC, USA: World Bank Publications. p.115.

৮. Blair, H. (2000). Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries, World Development, Vol.28, No.1, pp.21-39.

৯. Hossain, N and Akhter, S. (2011). Gender, Power and Politics in Bangladesh: a study for the Upazila Support Project. UNDP. Pp.25-27.

১০. Islam, S, M, Rahman, M. Habibur, Hossain, A & Rabbi, A (2014). The Functioning of Local Government Leadership in the Financial Development of Upazila Parishad: A Case Study on Sylhet Sadar Upazila. Journal of Business and Technical Progress.Vol-3, No-1. Business Review-Bangladesh. Pp.41-43.

১১. Jahan, R. (1976). Women in Politice: A Case Study of Bangladesh. (C. A., & J. Green, Eds.) Asian Women in Transition. Pp.227-250.

১২. Khan, A. S. (2013). Women Political Empowerment: Obstacles and Opportunities. New Delhi: Global Vision Publishing House. p. 143.

১৩. Latha A, P. (2010). Political Leadership of Women: Constraints and Challenges. Indian Political Science Association, pp. 1139-1148.

১৪. Mirya, M. H & Mannan, S. (2016). Upazila and Union Parishad

Governance: A Study on Institutional Relationship and Linkage: BIGD Special Publications Series No.1

১৫. Panday, P.K (2016). Women's Empowerment in South Asia: NGO interventions and Agency building in Bangladesh. New York, Routledge. Psychological Review, 109, Pp.573–598.

১৬. USAID (2016, June). Country Report on *Women's Reserved Seats in Bangladesh: A Systemic Analysis of Meaningful Representation.* Dhaka, Bangladesh. p.03.

১৭. http://khadimnagarup.sylhet.gov.bd

১৮. http://www.comilla.gov.bd

# লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এটি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা-টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্নাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ-মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হাবে।

লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটার মুদ্রিত হবে । বাংলা লেখায় ১২ সাইজে NikoshBan ফন্ট এবং ইংরেজি লেখায় ১০ সাইজে Times New Roman ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। মূল পান্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই পেন-ড্রাইভে প্রবন্ধের সফ্‌টকপি প্রেরণ করতে হবে।

প্রেরিতব্য পেন-ড্রাইভের কভারে লেখকের নাম, প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

প্রবন্ধে বাংলা একাডেমি অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মূল কপিসহ পাড়ুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ পরিচ্ছন্ন কপি সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।

প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবি ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

প্রবন্ধটির ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের একটি সংক্ষিপ্তসার (Abstract) অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে পারেন।

লেখা প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার কপি বিনামূল্যে পাবেন।

প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও পেন-ড্রাইভ সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

মুদ্রিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কেন্দ্র নির্ধারিত করে সম্মানী প্রদান করা হবে।